দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

চীনের তুলনায়
শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্র হিসেবে
ভারতের আত্মপ্রকাশ
পৃঃ ১১

যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতা
অভিন্ন দেওয়ানি বিধি
দাবি করে
—পৃঃ ২৭

৭০ বর্ষ, ৭ সংখ্যা।। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭।। ৮ আশ্বিন - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

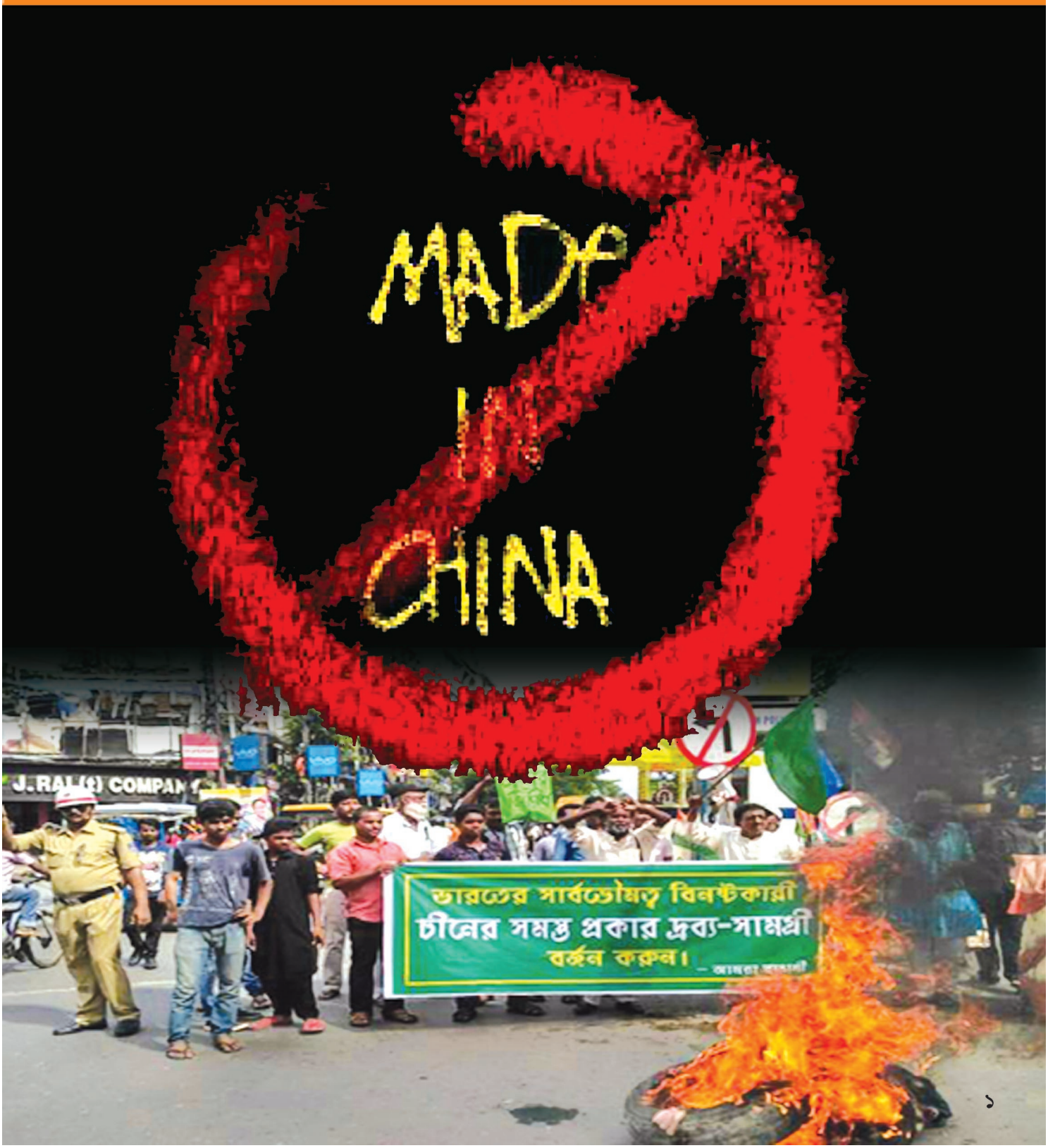

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৭ সংখ্যা, ৮ আশ্বিন, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

২৫ সেপ্টেম্বর - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

খোলা চিঠি : সরকারি কর্মচারীরা সবাই আসলে উ, ঊ □ সুন্দর মৌলিক □ ৯

কর্ণাটকের পুলিশ জানে না, দিদি জানেন গৌরীকে খুন করেছে হিন্দুত্ববাদীরা □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

চীনের তুলনায় শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের আত্মপ্রকাশ □ মানস ঘোষ □ ১১

শরতে শারদা দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী অকাল বোধন □ মৃণাল হোড় □ ১৪

গেরুয়া বিপ্লবের মাধ্যমেই বিদ্যুৎ চোরেরা বিদ্যুৎ চাষি হয়ে উঠতে পারে □ সাধন কুমার পাল □ ১৬

চীনের অর্থনৈতিক আগ্রাসন, ভারতের শিরঃপীড়া □ অম্লানকুসুম ঘোষ □ ১৯

চীনের গড়ে মোদীর হ্যাট্রিক □ প্রণয় রায় □ ২২

যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি দাবি করে □ রতন সারদা □ ২৭

বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার অনুষ্ঠান মহালয়া □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

হারিয়ে যাওয়া শহর পাণ্ডুয়া □ সঞ্জয় দেব □ ৩২

দ্রিঘাংচুর ভুয়োদর্শন— তালাক নিয়ে একী হালাক □ ৩৫

মুক্ত চিন্তা, মুক্ত মন মানেই কি বাম ভাবনা □ অমিতাভ সেন □ ৩৮

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় ও সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ □ চিঠিপত্র : ২৯-৩০ □ অঙ্গনা : ৩৪ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ অন্যরকম : ৪২

ফঃ ১

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যাই দীপাবলী সংখ্যা

প্রকাশিত হবে ১৬ অক্টোবর, ২০১৭

শক্তি-সাধনা বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দীপাবলীতে আমরা শক্তিরূপিণী মা কালীরই আরাধনা করে থাকি। এই সংখ্যার আলোচ্য শক্তিপূজা।

লিখেছেন— জয়ন্ত কুশারী, সন্দীপ দাঁ প্রমুখ।

।। দাম একই থাকছে : দশ টাকা।।

হকার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ স্বস্তিকার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

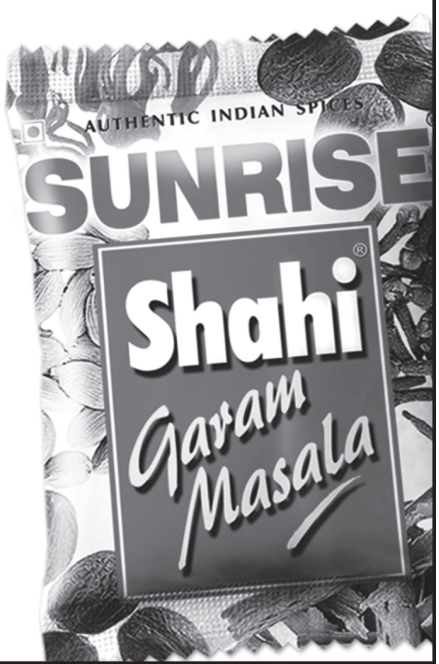

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

বিশ্বাসের প্রশ্ন

দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের সময়সীমা লইয়া গত বছরের মতো এই বৎসরও রাজ্য সরকার বিধিনিষেধ জারি করিয়াছে। এই বৎসরও গত বৎসরের মতো হিন্দু সমাজের কয়েকজন এই বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হইয়াছেন। সরকার সুর সামান্য নরম করিয়া সময়সীমা কয়েক ঘণ্টা বাড়াইয়াছে। কিন্তু মমতা ব্যানার্জির সরকার স্বেচ্ছায় এই সুর নরম করে নাই, আদালতের চাপে তাহা করিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি প্রথমে ঘোষণা করিয়াছিলেন বিজয়া দশমী তিথিতে (৩০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার মধ্যেই দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জন পর্ব শেষ করিতে হইবে। একাদশী তিথিতে (১ অক্টোবর) প্রতিমা বিসর্জন করা চলিবে না। একাদশীর দিন মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম পর্ব হইবার কারণে বিজয়া দশমী তিথিতে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনের উপর সন্ধ্যা ৬টার সময়েই নিষেধাজ্ঞার খাঁড়া নামিয়া আসিয়াছে। ইহার ফলে ওই দিন রাত্রিতে মহরমের মিছিল বের হইতে পারিবে, কিন্তু দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা করা যাইবে না। দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জন ও মহরমের মিছিল লইয়া সংঘর্ষ হইতে পারে—এই আশঙ্কায় বোধ হয়, মুখ্যমন্ত্রী প্রতিমা বিসর্জনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন—ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর কোনও আস্থা প্রদর্শন করেন নাই।

কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে সম্প্রদায় বিশেষকে তাহাদের উৎসব পালনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান এবং অন্যদিকে হিন্দু সমাজের পরম্পরাগত পূজার রীতিনীতির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি—এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক এবং তাহা হইয়াছেও। রাজ্য সরকারের এই নিষেধাজ্ঞা জারির বিরুদ্ধে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হইয়াছে। শুনানি চলাকালীন সরকারের তরফে মহাঅধিবক্তা জানাইয়াছেন যে এই সময়সীমা সন্ধ্যা ৬টা হইতে বাড়াইয়া রাত ১০টা পর্যন্ত করা হইয়াছে এবং ইহাই নাকি যথেষ্ট। যাহারা মামলা দায়ের করিয়াছিলেন তাঁহাদের যুক্তি হইল—পঞ্জিকার বিধি অনুযায়ী বিজয়া দশমী তিথিতে রাত্রি ১-৩০ মিনিট পর্যন্ত বিসর্জন হইতে পারে। আদালতে এই প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয় নাই—সরকারপক্ষ সময় চাহিয়াছে।

সম্প্রদায় বিশেষের মতো ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য একপক্ষকে যদি আদালতের দরজায় কড়া নাড়িতে হয়, তাহা হইলে সরকারের নিরপেক্ষতা লইয়াই সন্দেহ জাগে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে দুইটি ধর্মীয় উৎসবের সময়ের মধ্যে একটি আকস্মিক সমাপতন ঘটায় বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া সরকারের আশঙ্কা। এই প্রসঙ্গে উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতি নিশীথা মাত্রের বক্তব্যটি স্মরণীয়। গণেশ পূজা ও মহরম একই দিনে হইলেও মহারাষ্ট্রে আইন-শৃঙ্খলার কোনও সমস্যা হয় না। আইন-শৃঙ্খলার নামে (পড়ুন ভোটব্যাঙ্ক পলিটিক্সের জন্য) কোনও সমাজ-বিশেষের ধর্মীয় রীতিনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে হয় না। রাজ্য সরকার যদি দুই পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করিয়া তাঁহাদের রীতি অনুযায়ী উৎসব পালনে সহমতি তৈরির চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে এই আশঙ্কা অনেকাংশেই হ্রাস পাইত। শুধুমাত্র আইনি বিধিনিষেধ জারি করিয়া সংহতির প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হইবে, এমন ভাবনা সঙ্গত হইবে না।

সুভাষিতম্

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি ধন্যাস্তুতে ভারত ভূমি ভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদ মার্গভূতে ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ।।

দেবগণ এইরূপ গান করে থাকেন যে ভারতভূমি সত্যিই ধন্য, দেবতারা স্বর্গ ও মোক্ষ লাভের জন্য ভারত ভূমিতে দেবত্ব ত্যাগ করে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করেন।

পুজোসংখ্যার প্রকাশ উপলক্ষে জাতীয় ভাবধারা প্রচারে স্বস্তিকার আপোশহীন ভূমিকার স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বর্তমান সময়ে মৌলবাদকে যেভাবে প্ররোচিত করা হচ্ছে, তাতে স্বস্তিকার দায়িত্ব এই মৌলবাদকে রুখে দেশভক্ত শক্তিকে সংগঠিত করা। সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার ১৪২৪ পুজো সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত এক লেখক সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্টেরা এভাবেই স্মরণ করিয়ে দিলেন আমাদের দায়িত্ব। গত ১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতার কল্যাণ ভবনে এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস, বিশিষ্ট পরিবেশবিজ্ঞানী মোহিত রায়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী মণ্ডলের সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আলোচনার বিষয় ছিল বাংলায় সত্তর বছরে জাতীয় ভাবনার প্রসারে স্বস্তিকার ভূমিকা। সম্পাদক বিজয় আঢ্য তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে ১৯৪৮ সালে স্বস্তিকা পত্রিকার সূচনালগ্নেই প্রধানমন্ত্রী নেহরুর রোষে পত্রিকাটির পড়বার কথা স্মরণ করিয়ে আলোচনার সুরটি বেঁধে দেন।

এরপর একে একে এই বিষয়ে বলেন সাহিত্যিক রমানাথ রায়, অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন, প্রখ্যাত সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত প্রমুখ। রমানাথ রায় তাঁর বক্তব্যে মৌলবাদের আগ্রাসনের কথা মনে করিয়ে এবিষয়ে স্বস্তিকার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির গুরুত্ব উল্লেখ করেন।

রবিরঞ্জন সেন তাঁর ভাষণে দেশ-বিরোধী চক্রান্তের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এর বিরুদ্ধে স্বস্তিকার জাতীয়তাবোধ প্রসারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। রন্তিদেব সেনগুপ্ত কমিউনিস্ট মিথ্যাচারের বিষয় স্মরণ করিয়ে এর প্রতিবাদে স্বস্তিকার সদর্থক ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেন। অচিন্ত্য বিশ্বাস এবারের পুজোসংখ্যার প্রতিটি রচনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে একাধারে সংখ্যাটির উৎকর্ষতা, অন্যদিকে জাতীয় ভাবনার প্রতিফলনে এর তাৎপর্য উল্লেখ করেন। লেখকদের মতামতের সত্রটি পরিচালনার সময় অধ্যাপক মোহিত রায় স্বস্তিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিষয়ে আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ভাষণে সুনীলপদ গোস্বামী অসি-চালনার থেকে মসীর তীক্ষ্ণতা যে সমাজের পক্ষে আরও বেশি অপরিহার্য তা স্মরণ করিয়ে স্বস্তিকার শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী বর্তমানে যে শুধু বাংলারই নয়, গোটা দেশে জাতীয়তাবোধের প্রচারের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম তা স্পষ্ট করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে স্বস্তিকা পুজোসংখ্যা ও নিয়মিত সংখ্যার প্রায় সত্তর জন বিশিষ্ট লেখক-সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। অনেকেই পুজোর মুখে আসতে পারেননি। যাঁরা আসতে পারেননি তাঁরাও শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান ই-মেল, হোয়াটসঅ্যাপে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সন্দীপ চক্রবর্তী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও 'শস্ত্রপূজন' হবে : ভিএইচপি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মুখ্যমন্ত্রীর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বিজয়া দশমী তিথিতে 'শস্ত্রপূজন' হবে বলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সাফ জানিয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন পরিবার ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আগের মতোই এবছরও শস্ত্রপূজা হবে। এবছর ৩০ সেপ্টেম্বর বিজয়াদশমী। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংগঠন সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ সিংহ একথা জানিয়ে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে তিনশোর বেশি স্থানে তারা শস্ত্রপূজনের উদ্যোগ নিয়েছেন। রাজ্যের সব জেলা শাখাকেই শস্ত্রপূজনের আয়োজন করতে বলা হয়েছে। এই শস্ত্রপূজন দুর্গাপূজারই অঙ্গ। অশুভ শক্তির উপর শুভ শক্তির জয় হিসাবেই আমরা হিন্দুরা বিজয়াদশমী পালন করি। উল্লেখ্য, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুব শাখা বজরঙ্গ দল ও মহিলা শাখা দুর্গাবাহিনী ইতিমধ্যেই এ নিয়ে সচেষ্ট হয়েছে।

পরিষদের সূত্রে জানা গেছে, সংগঠনের সদস্যরা ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি ও পরিবারের পক্ষ থেকে শস্ত্র পূজনের অনুরোধ করা হচ্ছে। তরবারি, কুঠার, ছুরি, কাস্তে, বঁটি ইত্যাদিকে এদিন শস্ত্র হিসাবে পূজা করা হবে। এটা এই পূজারই একটি রীতি। পরিষদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের পূজার আচার-আচরণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করছেন, কিন্তু বিজয়া দশমীর পরের দিনই যে প্রকাশ্যে শস্ত্রাদির প্রদর্শন করা হয় তা নিয়ে নীরব। সরকার সকলের জন্য। এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে কোনো এক বিশেষ গোষ্ঠীকে তোষণ করাই সরকারের লক্ষ্য বলে মনে হয়।

উবাচ

"আমি কোনও ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে ভাবি না, কোনও ছোটখাটো কাজ করি না। ১২৫ কোটি মানুষ আমার সঙ্গে আছে। আমার স্বপ্নও তাই কোনও ছোট বিষয় নিয়ে নয়।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

নর্মদা বাঁধ উদ্বোধন প্রসঙ্গে

"সর্দার (প্যাটেল) ভারতের আঞ্চলিক, আম্বেদকর সামাজিক ও মোদী অর্থনৈতিক ঐক্য সাধন করেছেন।"

অমিত শাহ
বিজেপির সভাপতি

মোদীর ৬৭তম জন্মদিনে নিজের ব্লগে

"রাষ্ট্রসঙ্ঘে যে বিষয়টি নিয়ে কয়েক দশক ধরে আলোচনা হয়নি, সেই বিষয়টিকে যদি পাকিস্তান ক্রমাগত খুঁচিয়ে যেতে থাকে, তাহলে বলতেই হয়, মিয়াঁর দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।"

সৈয়দ আকবরউদ্দিন
রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি

ভারতের নিরাপত্তা পরিষদে সদস্য হওয়া প্রসঙ্গে

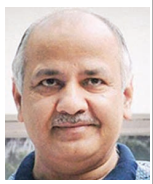

"২০১৯-এ বিজেপিকে টক্কর দেওয়ার মতো কোনও বিশ্বাসযোগ্য বিরোধী নেই।"

মনীশ শিশোদিয়া
ডেপুটি চীফ মিনিস্টার, দিল্লি

২০১৯-র লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের জয়ের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে

"রাজ্য তো দার্জিলিংয়ে, বাদুড়িয়ায় কেন্দ্রীয়বাহিনী চেয়েছে। পেয়েছেও। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারলে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয়বাহিনী চেয়ে পাঠাক।"

দিলীপ ঘোষ
বিজেপি রাজ্য সভাপতি

বিসর্জন ও মহরম একসঙ্গে শান্তিপূর্ণ ভাবে করার জন্য

খাওয়া-পরায় বিধিনিষেধ আরোপ হিন্দুত্ব নয় : মোহন ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কে কী খাবে বা কে কী পরবে তাই নিয়ে ফতোয়া জারি করা হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খায় না। সম্প্রতি এই মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভগবত। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা সহিষ্ণুতা অসহিষ্ণুতা সংক্রান্ত বিতর্কে এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। প্রতিবাদের নামে আজকাল যেরকম 'ট্রোলিং' (ব্যক্তি আক্রমণ, গালিগালাজ, অশ্লীল ভাষায় কুৎসা ইত্যাদি) হয় তার বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক। তাঁর মতে এসব আগ্রাসী মনোভাবের পরিচায়ক। মাঝে মাঝে এদের মন্তব্য অসহনীয় মনস্তাপের সৃষ্টি করে। তিনি জানান, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং বিজেপি দুটি পৃথক সংগঠন। কেউ কারও চিন্তন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে না। বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশটি দেশ থেকে আসা রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি একথা বলেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সরসঙ্ঘচালক শ্রীভাগবত বলেন, 'হিন্দুত্ব হলো সব মানুষকে যে-যেরকম তাকে সেভাবে গ্রহণ করা। হিন্দুত্বের বৈশিষ্ট্য প্রায়শই বদলায়। এই বদল ঠেকিয়ে রাখা যায় না।' গোরক্ষা আন্দোলনে গোরক্ষকদের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত, এই আন্দোলনকে দক্ষিণপন্থী মৌলবাদের তকমা দিয়ে যে প্রচার চালানো হচ্ছে তা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রতিবাদের নামে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া চলবে না। তিনি স্পষ্ট বলেন, হিন্দুত্ব মানে কে কী খাবে বা পরবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও প্রতিবাদের নামে গুণ্ডামি করা যাবে না বলে জানিয়েছেন। যেখানে যেখানে অভিযোগ পাওয়া গেছে তার তদন্তও শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি।

ভগিনী নিবেদিতা সার্ধ-জন্মশতাব্দীর আমন্ত্রণ

ভগিনী নিবেদিতার সার্ধ-জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আগামী ৩ অক্টোবর, ২০১৭, মঙ্গলবার বিকাল ৫ টায় কলকাতায় সায়েন্স সিটি প্রেক্ষাগৃহে এক সভায় আয়োজন করা হয়েছে। ওই সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মাননীয় শ্রীমোহনরাও ভাগবত। উদ্যোক্তাদের পক্ষে সকল নাগরিকদের এই সভায় উপস্থিত থাকবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) থেকে ৫ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার), ২০১৭ অবধি 'স্বস্তিকা'র সমস্ত বিভাগ পূজাবকাশ উপলক্ষে বন্ধ থাকবে। ২ ও ৯ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখের সংখ্যা দুটি প্রকাশিত হবে না।

৬ অক্টোবর, ২০১৭ শুক্রবার স্বস্তিকার দপ্তরের সমস্ত বিভাগে যথারীতি কাজ শুরু হবে এবং ১৬ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখের সংখ্যা থেকে স্বস্তিকা নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক, স্বস্তিকা

প্রয়োজনের তুলনায় পুলিশ কম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সুযোগ পেলে রাজনৈতিক নেতারা প্রায়শই সাধারণ জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু দেশে ভিআইপি সংস্কৃতি বেড়েই চলে। সাম্প্রতিক সরকারি তথ্য থেকে জানা গেছে, দেশের ২০,০০০ ভিআইপির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য গড়ে প্রায় ৬০,০০০ পুলিশকর্মী ব্যস্ত থাকেন। অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য প্রায় তিনজন। অথচ সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়ার মতো যথেষ্ট পুলিশ সরকারের নেই।

সম্প্রতি ব্যুরো অব পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিপি আর অ্যান্ড ডি) পক্ষ থেকে একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। তাতেই উঠে এসেছে এই তথ্য। সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের মোট ১৯.২৬ লক্ষ পুলিশ অফিসারের মধ্যে ২৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২০,৮২৮ জন ভি আই পি-র নিরাপত্তার জন্য ৫৬,৯৪৪ জন সারাবছর নিযুক্ত থাকেন।

অর্থাৎ প্রত্যেক ভিআইপি-র জন্য অঙ্কের নিয়মে ২.৭৩ জন পুলিশকর্মীর প্রয়োজন। একমাত্র লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের কেউ ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশের সাহায্য নেন না। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তায় নিযুক্ত পুলিশের সংখ্যা এ দেশে উল্লেখযোগ্যভাবে কম। ৬৬৩ জন ভারতীয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকেন একজন পুলিশ অফিসার।

সংশোধনী

স্বস্তিকার ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সংখ্যায় 'স্বামী বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ' নিবন্ধের লেখক ড. কল্যাণ চক্রবর্তীর পরিচয় কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর অব রিসার্চ ছাপা হয়েছে। লেখক কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডায়রেক্টরেট অব রিসার্চের অধীনস্থ অধ্যাপক। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।

সরকারি কর্মচারীরা সবাই আসলে উ, ঊ

মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এক লাফে ১৫ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি। হাততালি পাওয়ার মতোই ঘোষণা। নজরুল মঞ্চে সরকারি কর্মচারীদের হাততালিও পেয়েছেন আপনি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ডিএ-র সঙ্গে যা পেয়েছেন তা হজম করতে পারছেন না অনেকেই। রাজ্য সরকারি কর্মীদের বক্তব্য, ''আগামী জানুয়ারি মাসে নতুন ডিএ কার্যকর হবে। তার আগে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন ডিএ ঘোষণা করে দিলে আবার পিছিয়ে পড়ব আমরা। সুতরাং আবার আমাদের 'ঘেউ ঘেউ' করতে হবে।'' আমি বলি সে তো হবেই। কেন্দ্র বাড়াচ্ছে বলে কি দিদিকেও বাড়াতে হবে নাকি। ওরা তো নোট ছেপে দিয়ে দেয়। আপনার কাছে তো আর সেই সুযোগ নেই। এরা বোঝে না যে টাকা চাইলেই— ঘেউ ঘেউ করলেই টাকা পাওয়া যায় না।

সেই যে দিদি সহজপাঠ বইতে পড়েছিলাম না, 'উ ঊ, ডাক ছাড়ে ঘেউ ঘেউ' সেই হয়েছে অবস্থা। আমার তো মনে হয় সরকারি কর্মীরা মানে হরিপদ কেরানি, মাস্টার অধ্যাপকরা হলো ইয়ে মানে উ, ঊ। খালি ঘেউ ঘেউ করে।

ডিএ ঘোষণার আগে আপনার বক্তব্যকেই শালীনতার সীমা লঙ্ঘন মনে করেছে বিরোধীরা। আমি অবশ্য ওদের কথায় কান দিই না। আপনার দলের সরকারি কর্মীরাও বলছে, ''ডিএ কিংবা বেতন সবটাই কর্মীদের প্রাপ্য। এটা কোনও দয়ার দান নয়। নায্য পাওনা চাওয়ার জন্য আমরা কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করি বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আমাদের নেত্রী হলেও এটা খুবই অসম্মানজনক।'' এদের দিদি যাই বলুন আপনি লাই দিয়ে মাথায় তুলেছেন। সবাইকে ধরে ধরে চাবকানো উচিত।

এই নিয়ে আবার বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে বিজেপির সরকারি কর্মচারী সংগঠন। ইতিমধ্যেই আদালতে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। সরকারি কর্মচারী পরিষদের আহ্বায়ক দেবাশিস শীল জানিয়েছেন, ''মুখ্যমন্ত্রীর ওই মন্তব্যের প্রতিবাদ করছি আমরা। কর্মীদের কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁকে এর জন্য প্রকাশ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। আজই চিঠি পাঠানো হচ্ছে। এর পরে আমরা আদালতে যাব সরকারি কর্মচারীদের সম্মান আদায়ের জন্য।'' যাক, আদালতে যাক। আপনি দিদি অনেক দেখেছেন আদালত। হারলে হারবেন কিন্তু ক্ষমা- টমা চাইবেন না। কারণ, কুকুরকে কুকুর বলাটা কোনও অপরাধ নয়। তাছাড়া আপনি তো আর সরাসরি বলেননি। ঠিক ঠাক ভাবলে তো সরকারি কর্মীরা আপনার চাকরবাকর। তাই না।

আপনি বলেছেন, ''প্রচণ্ড আর্থিক সঙ্কটের মধ্যেও এটুকু ব্যবস্থা করতে পেরেছি। মিউ মিউ, ঘেউ ঘেউ করে লাভ নেই। আমাকে কাউকে বলতে হয় না। আমাকে চাপ দিয়ে লাভ নেই। যেটা করতে পারি, নিজে করি। যেটা করতে পারি না, করি না।'' ঠিক কথাই তো। দিচ্ছেন এটাই অনেক। সাত পুরুষের ভাগ্য। আবার কথা কীসের শুনি?

রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেন, ''সরকারি কর্মীরা নিজেদের যোগ্যতায় চাকরি পান। কারও দয়ায় নয়। সুতরাং, নিজেদের দাবিতে তাঁরা সরব হতেই পারেন। দাবি মেটাতে না পারাটা সরকারের ব্যর্থতা। তাই বলে তাদের পশুর সঙ্গে তুলনা করাটা অনুচিত। মুখ্যমন্ত্রী নিজের রুচির পরিচয় দিয়েছেন।'' এখানেই না থেমে দিলীপ ঘোষ বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী 'বেতন নেবেন না, ডিএ নেবেন' বলে হুমকিও দিয়েছেন নজরুল মঞ্চে। ওই পদে বসে এই ভাষা মানায় না। তিনি আসলে সরকারি কর্মীদের নিজের দলের কর্মী মনে করেন। আমরা দলের কর্মীদেরও সম্মান করি। তৃণমূলে সেই কালচারটাই নেই।'' দিদি আপনি কোনও জবাব দেননি। আমি বলে দিচ্ছি আপনার হয়ে। দিলীপবাবু আপনার কাছে দিদিকে কালচার শিখতে হবে না। দিদি নিজেই একটি আস্ত কালচার। ছবি থেকে কবিতা, গান থেকে স্লোগান সবেতেই দিদি কালচারের মেলা। সংস্কৃতির আর এক নাম মমতা।

বরং দিলীপবাবু দেখুন দিদি কেমন কর্মসংস্কৃতি তৈরি করেছেন। বনধ করা যাবে না কিন্তু ছুটি নেওয়া যাবে। আরে বাবা ছুটিও তো একটা সংস্কৃতি নাকি। গত বছরেই পঞ্চমীতে ছুটি দিয়ে সরকারি কর্মচারীদের দুর্গাপুজোর রং বদলে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবারেও বাড়ছে ছুটি। এবার পুজোয় ছুটি ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর। ১৩ দিনের ছুটি শুরু মঙ্গলবার থেকে। ১২ তারিখ সোমবার ছুটি নিয়ে নিলেই সেই ছুটি আরও লম্বা হয়ে ১৬ দিনের হবে। এমন হিসেব খোদ মুখ্যমন্ত্রীই পেশ করেছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের সমাবেশে। সত্যি দিদি আপনার জবাব নেই। ছুটির ফাঁক দেখিয়ে দেওয়ার এমন নজির মোদী কেন কোনও মুখ্যমন্ত্রীই দেখাতে পারেননি। দিলীপ ঘোষরা বুঝবেন না, ইতিহাস মনে রাখবে আপনাকে। এক বছর আগে আপনিই মনে হয় প্রথম যিনি আগামী বছরের ছুটির তালিকা জানিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন আগামী বছর ১৫ দিনের পুজোর ছুটি। এই সরকার সরকারি ছুটি বাড়িয়ে ২৭ থেকে ৩৫ দিন করেছে। এই আমলে মাতৃত্বকালীন ছুটি, পিতৃত্বকালীন ছুটি বাড়ানো হয়েছে। ইতিহাস এই কর্ম সংস্কৃতি মনে রাখবে।

—সুন্দর মৌলিক

কর্ণাটকের পুলিশ জানে না, দিদি জানেন গৌরীকে খুন করেছে হিন্দুত্ববাদীরা

মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ নয়। সম্প্রতি মহিলা সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশকে কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করেছে অজ্ঞাতনামা আততায়ীরা। খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে মোটর বাইকে চড়ে দু'জন এসেছিল। সাংবাদিক হত্যাকে নির্ভয়ে অকুণ্ঠভাবে নিন্দা করা উচিত সকলেরই। কিন্তু নিন্দা করতে গিয়ে বিজেপি বিরোধী রাজনীতিকরা যেভাবে সঙ্ঘপরিবার এবং বিজেপিকে খুনির তকমা দিয়ে জনরোষকে ক্রমাগত উস্কানি দিয়ে চলেছে যা মানা যায় না। কারণ, কর্ণাটক রাজ্যে কংগ্রেসের শাসন চলছে। গৌরীর খুনিদের ধরতে ব্যর্থ হওয়ার দায় নিতে হবে সেই রাজ্যের পুলিশ এবং প্রশাসনকে। আর এস এস বা বিজেপিকে নয়। কর্ণাটক পুলিশ হত্যাকারীদের সন্ধানে সর্বশক্তি দিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে। কিন্তু খুনিদের পরিচয় এবং খুনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সামান্যতম সূত্রও পায়নি। অথচ গৌরীর খুন হয়ে যাওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রাহুল গান্ধী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করে দিলেন যে হিন্দুত্ববাদীরাই এই কুকাজ করেছে। তাঁদের যুক্তি, গৌরী তাঁর কন্নড় ভাষার ট্যাবলয়েড পত্রিকা 'গৌরী লঙ্কেশ-পত্রিকে'-তে নিয়মিতভাবে সঙ্ঘ পরিবার এবং বিজেপির নীতি আদর্শের কড়া সমালোচনা করতেন। মমতা দিদির মতে এই সমালোচনার জন্যই তিনি খুন হন। প্রশ্ন হচ্ছে, গৌরী লঙ্কেশ পত্রিকে-র জন্ম হয় ২০০৫ সালে। নকশালপন্থী এই পত্রিকাটি জন্ম থেকে গত ১২ বছর টানা হিন্দুত্ব এবং জাতীয়তাবাদের কঠোর সমালোচনা করে চলেছে। গৌরীর ব্যক্তিগত ভাবে নিজের মাওবাদের উপর অগাধ বিশ্বাস এবং আস্থা ছিল। এই নিয়ে তাঁর ভাই ইন্দ্রজিৎ লঙ্কেশের সঙ্গে তাঁদের পারিবারিক কাগজ লঙ্কেশ পত্রিকের সম্পাদনা নিয়ে বিরোধ হয়। গৌরী সক্রিয়ভাবে মাওবাদীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন মাওবাদী নেতাদের রাজনৈতিক বক্তব্য এবং সাক্ষাৎকার নিয়মিতভাবে ছাপা হোক। লঙ্কেশ পরিবার রাজি না হওয়ায় গৌরী নিজেই উগ্র বামপন্থার

গূঢ় পুরুষের কলম

প্রচার করতে নতুন একটি পত্রিকা (গৌরী লঙ্কেশ পত্রিকে) প্রকাশ শুরু করেন। বারো বছর ধরে হিন্দুত্ববাদকে তুলোধোনা করার পর হঠাৎ এত বছর পরে তাঁর উপর প্রাণঘাতী হামলা হবে কেন? বিশেষত, গৌরী নিজে কখনও তাঁকে কেউ প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে বলে পুলিশ বা প্রশাসনকে জানাননি। মৃত্যুর দু'দিন আগে তিনি রাজ্যের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার সঙ্গে টানা দু' ঘণ্টা কথা বলেছেন। গৌরী তাঁর উপর হামলা হতে পারে এমন কোনো ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীকে দেননি। অথচ দিদি কলকাতায় বসে বলে দিলেন হিন্দুত্ববাদীরাই গৌরীকে খুন করেছে। কীসের ভিত্তিতে? দিদির কাছে সূত্র থাকলে তা অবিলম্বে কর্ণাটকের প্রশাসনকে জানান। ব্যক্তিগত ভাবে আমি গৌরীর অকালমৃত্যুতে শোকাহত। দেশের সমস্ত সাংবাদিকরাই চান তাঁর হত্যা রহস্যের সমাধান হোক। দিদি, প্লিজ সাহায্য করুন।

১৯৯২ থেকে ২০১৭-এর মধ্যে মোট ৬৭ জন ভারতীয় সাংবাদিক কর্তব্যরত অবস্থায় খুন হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র ৯ জন ইংরেজি ভাষার পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। তুলনায় আঞ্চলিক ভাষার সাংবাদিকের খুনের হার বেশি।

তথ্যসূত্র : কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট

প্রসঙ্গত, গৌরীর খুনের পর তাঁর ভাই ইন্দ্রজিৎ লঙ্কেশ মিডিয়ার সামনে দাবি করেন, মাওবাদীরাই তাঁর দিদিকে সম্ভবত হত্যা করেছে। গৌরী মাওবাদীদের একাংশকে সমাজের মূল স্রোতে ফেরাতে চেয়েছিলেন। এই জন্যই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রায় দু' ঘণ্টা কথা বলেন। আর সেটাই মাওবাদীদের শীর্ষ নেতৃত্বের রাগ বাড়িয়েছিল। ইন্দ্রজিতের কথায়, ''আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় মাওবাদীরা আমার দিদির উপর অখুশি ছিল। দিদি ওদের অনেককে মূলস্রোতে ফিরিয়েছিল। বিশেষ করে মাওবাদীদের শীর্ষনেতা সিরিমানে নাগারাজকে মূলস্রোতে ফেরানোর পর ওদের রাগ বেড়েছিল।'' লঙ্কেশ পরিবারের সকলেই হিংসার রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়াতে তাঁকে বারণ করেছিলেন। সাংবাদিকতার বিপদটা এখানেই। সাংবাদিকতার আড়ালে নকশাল নেত্রী হওয়ার প্রলোভনটা গৌরী ছাড়তে পারেননি। অনেকেই পারেন না। কলকাতার বাংলা কাগজের মাতব্বর গোছের সাংবাদিকদের বড় অংশ এখন মমতাপন্থী চামচা সাংবাদিক। দিদি বললেন, আর এস এস-বিজেপি গৌরী লঙ্কেশকে খুন করেছে। আর যায় কোথায়? মাতব্বর সাংবাদিকরা কলকাতা প্রেসক্লাব থেকে হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে হৈ হৈ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। সবার আগে মোমবাতি হাতে দিদি। হায়! পশ্চিমবঙ্গের মহিলা সাংবাদিক চৈতালি সাঁতরা খুন হয়ে যান তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে। তারিখটা ছিল ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১২। আজও কেউ ধরা পড়েনি। একজনও মোমবাতি হাতে পথে হাঁটেনি। বাংলার সাংবাদিকদের কাউকে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে দেখিনি। কারণ, চৈতালি মাতব্বর সাংবাদিক ছিলেন না। কাজ করতেন একটি হিন্দি দৈনিকের ফ্রিল্যান্সার হিসেবে।

চীনের তুলনায় শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের আত্মপ্রকাশ

মানস ঘোষ

ডোকলামে ভারত ও চীনের সেনা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৫৬ ইঞ্চি ছাতির গরিমা নিয়ে বিরোধীরা প্রচুর তির্যক মন্তব্য ও কটূক্তি করে থাকে। তাঁকে উপহাসের পাত্র করে অনেক নিম্নস্তরের সমালোচনা ও নিন্দেমন্দ করেছেন বিরোধী নেতৃবৃন্দ। বিশেষ করে রাহুল গান্ধী ও বামপন্থীরা। কিন্তু ডোকলামে ৭৩ দিন ধরে ভারত চীনের চোখে চোখ রেখে বেজিং-এর নগ্ন আগ্রাসী ভূমিকাকে যেভাবে সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করলো তাতে তাঁর ৫৬ ইঞ্চি ছাতি ফুলে ফেঁপে ৭২ ইঞ্চি বা তারও বেশি হবার কথা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি যে চরম দক্ষতার সঙ্গে ভুটানের ডোকলাম মালভূমিকে চীনের অভিসন্ধিমূলক জবরদখলের আগ্রাসী চালকে ব্যর্থ করলেন, তা সাম্প্রতিককালে ভারতের অন্য কোনো প্রধানমন্ত্রী করতে সক্ষম হননি। তাঁর কূটনীতির চালে পরাস্ত হয়ে চীনের নেতৃত্ব শুধু নিজেদের মুখই পোড়ায়নি তাদের নয়া সম্প্রসারণবাদের মুখোশও খসে পড়েছে। যার ফলে বিশ্বজুড়ে চীনের ভাবমূর্তি এক বিরাট ধাক্কা খেয়েছে।

১৯৬২-তে নেহরুর অবিমৃশ্যকারিতায় চীনা আগ্রাসনের কাছে পর্যুদস্ত হওয়ার পর ভারত যে হীনমন্যতায় ভুগতো, সেটা ডোকলাম কাণ্ডের পর অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে। বরং বলা যেতে পারে চীনের রণহুঙ্কার ও হম্বিতম্বিকে মোদী কোনও পাত্তা না দিয়ে এবং বেজিং-এর কাছে নতজানু না হওয়ার সাহস দেখিয়ে বিশ্বজুড়ে ভারতের মানমর্যাদাকে সম্ভ্রমের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। সেই কারণে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো এখন চীনের তুলনায় ভারতের প্রতি আরও বেশি আস্থাশীল। কারণ তারা জেনে গেছে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের দাদাগিরির যোগ্য জবাব দেবার ক্ষমতা ধরে একমাত্র ভারত। শুধু প্রতিবেশী দেশগুলোই নয় সুদূর প্রাচ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো--- জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ভারতের রুখে দাঁড়ানোয় রীতিমতো মানসিক বল ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। এই দেশগুলো দক্ষিণ চীন সমুদ্র বা 'ইস্ট সি'র মালিকানা নিয়ে চীনের সঙ্গে এক ঘোর বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে। ওই সমুদ্রের গভীরে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেলের ভাণ্ডার আছে। তার সঙ্গে আছে প্রচুর সামুদ্রিক মাছের উৎস।

সেই জন্য চীন এই পুরো সমুদ্রকে গাজোয়ারি করে নিজের জলসীমানার অংশ বলে একরকম ঘোষণা করেছে। ওই সমুদ্রে এবং লাগোয়া অঞ্চলে বেশ কয়েকটি জনমানবশূন্য দ্বীপ আছে--- যেমন সেনকাকু --- যা জাপানের সামুদ্রিক জলসীমার মধ্যে পড়ে। ইতিহাসের দলিল দস্তাবেজও প্রমাণ করে এই দ্বীপগুলো জাপানের। কিন্তু চীন তার আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে সেনকাকুকে নিজের বলে দাবি করছে এবং জাপানকে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করছে সেখানে কোনও নৌযান বা বিমান না পাঠাতে। ওই সমুদ্রে ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইনের উপকূল এলাকার অদূরে বেশ কয়েকটি দ্বীপ আছে যা আন্তর্জাতিক জলসীমার আইন অনুযায়ী ওই দুটি দেশের অংশ বলে গণ্য হয়ে আসছে। কিন্তু বেজিং তা মানতে নারাজ এবং গাজোয়ারি করে সেগুলোর দখল নিয়েছে। সেখানে প্রচুর মাটি ও পাথর ফেলে দ্বীপগুলোর আয়তন বৃদ্ধির কাজে জোরকদমে নেমেছে। পুরো দক্ষিণ চীন সমুদ্রকে নিজের দেশের অংশ বলে চালানোর চেষ্টা করছে। সেখানে বিদেশি জাহাজ ও বিমানের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বেজিং-এর এই একতরফা দাদাগিরির সিদ্ধান্ত জাপানের মতো দেশও অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। হেগের আন্তর্জাতিক আদালত চীনের এই চাপিয়ে

দেওয়া সিদ্ধান্ত নাকচ করলেও, বেজিং ওই আদালতের সিদ্ধান্তকে মানতে নারাজ। চীনকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত জলসীমার আইন মেনে চলার নির্দেশ দিলেও, বেজিং তা মানছে না।

সুতরাং এহেন চীন যখন গত জুন মাসে ডোকলাম উপত্যকা সংলগ্ন এলাকায় যেখানে তিনটি দেশ ভারত, ভুটান ও চীনের সীমান্ত এসে মিশেছে— নিজের বলে দাবি করে সেখানে প্রচুর সৈন্যসামন্ত পাঠায় তার দখল নিতে, তখন সারা বিশ্বের নজর ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওপর। তিনি চীনা চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবিলা করেন তার ওপর। জাপান, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার নেতারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। তাঁরা জানতেন চীন ডোকলাম দখল করলেই ভারতের প্রতিরক্ষার নিরিখে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর এলাকা— 'চিকেনস নেক' চীনের কামানের গোলার নাগালে চলে আসবে এবং কালক্রমে চীন এই করিডোর দখল করে ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলকে দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে এটারও দখল নেবে। মাত্র ১৭ কিলোমিটার চওড়া এই করিডোর যা উত্তরে ভুটান ও দক্ষিণে বাংলাদেশের সীমান্তে মিশে গেছে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে ভারতের মূল ভূখণ্ডের এটাই একমাত্র সংযোগকারী 'লাইফলাইন'।

বেজিং অনেক অঙ্ক কষে ডোকলাম দখলের অভিযানে নামে। চীনা নেতারা ভেবেছিল জোর করে ডোকলাম নিজের দখলে নিলে ক্ষুদ্র ও দুর্বল ভুটান প্রতিরোধ করার সাহস পাবে না। আর ভারত ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রও ভুটানের সমর্থনে এগিয়ে এসে চীনের সঙ্গে খামোকা সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। চীনা নেতৃত্ব ভেবেছিল ১৯৬২ সালের যুদ্ধে ভারতের শোচনীয় পরাজয়ের অভিজ্ঞতা ভারতীয় নেতৃত্ব ও সেনাবাহিনীকে দুঃস্বপ্নের মতো এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে। সুতরাং ভুটানের মতো দেশের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে ভারত চীনের সঙ্গে অযথা ঝুটঝামেলায় জড়াবে না। মনমোহন সিংহের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে চীন ভারতকে হুমকি ধমকি দিয়ে অনেকটা বশে আনতে পেরেছিল। আর ডোকলাম নিয়ে ভারত যদি বেগোড়বাই করে তাহলে হুমকি ধমকির মাত্রাটা আরও বাড়িয়ে দিলেই ভারত চীনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চীনা নেতৃত্ব চিনতে ভুল করেছিল। ভারতের এই প্রধানমন্ত্রী যে অন্য ধাতুতে গড়া সেটা তারা জানতো না। জানলে ডোকলাম নিয়ে এমন মূর্খামি করতো না। ডোকলাম ভুটানের হলেও তাকে ঘিরে যে ভারতের জাতীয় স্বার্থ ও মান-মর্যাদা জড়িত সেটা বুঝতে তাঁর কালবিলম্ব হয়নি। ডোকলাম অভিযান যে চীনের আগ্রাসী নীতির প্রতিফলন তা বুঝতে পেরেই তিনি জওহরলাল নেহরুর মতো গড়িমসি না করে সেনাবাহিনীকে চীনাদের প্রতিরোধ করতে বলেছিলেন। আমাদের সেনাবাহিনীর বীর জওয়ানেরা কোনও গোলাগুলি না ছুড়ে শুধু বুক চিতিয়ে ডোকলামে প্রতিরোধের দেওয়াল খাড়া করেছিল যা চীনা বাহিনী বার বার চেষ্টা করেও লঙ্ঘন করতে পারেনি।

নরেন্দ্র মোদী জানতেন তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম তিন বছরের মেয়াদকালে ডোকলাম সঙ্কট মোকাবিলা হচ্ছে তাঁর সবচেয়ে বড় এবং কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। কারণ ডোকলামে চীন ভারতকে যে ধরনের স্নায়ু ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছিল তাতে ভারত যদি এঁটে উঠতে না পারে তাহলে দিল্লির পক্ষে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের একাধিপত্য ঠেকানো খুবই মুশকিল। ফলে ভারতকে চীনের বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। শুধু প্রতিবেশী দেশগুলোই নয় সুদূর প্রাচ্য এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো যারা চীনের গাজোয়ারি নীতির ফলে অতিষ্ঠ, তারাও ভারতের জবাবি উত্তর কী হবে তার দিকে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে ছিল। ভারত বেজিং-এর হুমকি ধমকির কাছে মাথা নোয়ায় কিনা সেই প্রশ্ন দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নেতাদের মুখে মুখে ঘুরেছে। কারণ তাঁরা চাইছিল ভারত রুখে দাঁড়াক এবং তাঁদের সাহস জোগাক। মোদী ঠিক সেটাই করে দেখালেন এবং সারা বিশ্বকে চমকে দিলেন। তিনি প্রমাণ করলেন ভারত চীনের সমকক্ষ না হলেও প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। ফলে তিনি চীনের সম্প্রসারণবাদী নীতিকে শুধু পরাস্তই করলেন না, ভুটানের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতাও অক্ষত রাখলেন। ফলে ভুটানের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ভারতের দায়বদ্ধতা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন।

যে কারণে বেজিং ভারতের ওপর রেগে অগ্নিশর্মা ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। সব ধরনের শোভনতা বর্জন করে লাগামহীন ভাবে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করে। এমনকী ভারতের বাপবাপান্ত করতেও ছাড়েনি। চীনের বর্তমান সংস্কৃতি যে কত নিম্নস্তরের তার পরিচয় পাওয়া যায় এক সরকারি মুখপত্রের বক্তব্য থেকে। ওই মুখপত্রটি বলেন, 'ভারতীয় সৈন্য ডোকলামে ঢুকে আমাদের বাহিনীর সঙ্গে যে অভব্য আচরণ করেছে, তার জন্য আমরা ভারতীয়দের এমন শিক্ষা দেবো যে তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কথাও ভুলে যাবে।'

আসলে মোদী চীনকে এশিয়ার একজন অধিপতি হিসেবে মেনে নিতে নারাজ। এশিয়া ও অন্যান্য মহাদেশে বেজিং-এর আধিপত্যবাদের নীতি মোদী সরকার কোনোভাবেই মেনে নিতে রাজি নয়। ফলে ওই সম্প্রসারণবাদী নীতিকে প্রতিরোধ করার জন্য যা করা প্রয়োজন তাই করছেন মোদী। সেই কারণে বেজিং বেজায় চটেছে। এক চীনা ভাষ্যকার লিখেছেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাক্রমশালী দেশ যখন এশিয়ায় আমাদের সমীহ করে চলে এবং আমাদের প্রতিরোধ করার দুঃসাহস দেখায় না তখন ভারতের মতো এক দুর্বল দেশ চীনের কাছে নতিস্বীকার না করে, ডোকলাম যে চীনের অংশ তা অস্বীকার করে ভুটানের ত্রাতা সাজার চেষ্টা করে কোন সাহসে?' এই মন্তব্য থেকেই পরিষ্কার প্রধানমন্ত্রী

মোদী চীনের দর্পকে কীভাবে এক বিশাল ধাক্কা দিয়েছেন। আর সেই ধাক্কা চীন কোনোভাবেই হজম করতে পারেনি বলে ভারতের বিরুদ্ধে চরম কুরুচিকর প্রচার চালায়।

যেহেতু আমাদের সাহসী শিখ সেনারা ডোকলামে বুক চিতিয়ে খালি হাতে চীনের লাল ফৌজকে নাস্তানাবুদ করার স্পর্ধা দেখিয়ে ভুটান ভূখণ্ডে তাদের ঢুকতে বাধা দেয়। সেই কারণে চীনের টিভি পর্দায় দেখা যায়, শিখদের নিয়ে নানা ঠাট্টা তামাশার প্রোগ্রাম। চীনা মেয়েরা মুখে নকল দাড়ি এবং মাথায় পাগড়ি পরে নানান ভাঁড়ামি ও রুচিহীন প্রোগ্রাম দেখানো হয়। নিম্ন রুচির এইসব কাজ করেও চীনারা ক্ষান্ত থাকেনি। তার সঙ্গে সরকারি নিয়ন্ত্রিত মিডিয়াকেও 'আসন্ন চীন-ভারত যুদ্ধের জন্য' নগ্নভাবে ব্যবহার করা হয়। এমন সব কথা ও লেখা ছাপা হয় যে 'চীনের আপামর জনসাধারণ চাইছে তাদের লাল ফৌজ ভারতকে এমন শিক্ষা দিক যাতে দেশটির শিরদাড়া ভেঙে গুড়িয়ে যায় এবং দেশটি ভবিষ্যতে যাতে আর উঠে দাঁড়াতে না পারে।' চীনা মিডিয়ায় বলা হলো 'ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার এবং সেই যুদ্ধে ভারতের হার হবে ১৯৬২-এর চেয়ে অনেক বেশি অপমানজনক।'

চীনের এতো প্ররোচনা সত্ত্বেও মোদী সরকার ধীর, স্থির ও শান্ত থেকেছে যা বিশ্বজুড়ে খুবই প্রশংসিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ডোকলাম নিয়ে চীনের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও ব্যয় করেননি। বরং তাঁর বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজকে দিয়ে মাত্র দুটি বিবৃতি দেওয়ান যাতে তিনি যুদ্ধ নয়, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সঙ্কট সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি চীনকে মনে করিয়ে দেন 'দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত চুক্তি বলবৎ আছে। সেই চুক্তি অনুযায়ী ভারত বা চীন একতরফাভাবে সীমান্তের বর্তমান অবস্থা পাল্টাতে পারবে না। চীন যুদ্ধং দেহী মনোভাব দেখিয়ে ভুল করছে। যুদ্ধ হলে দুই দেশেরই ক্ষতি হবে, কিন্তু চীনের ক্ষতির পরিমাণ হবে অনেক বেশি।' চীন প্রত্যুত্তরে বলে আলাপ আলোচনার সময় পেরিয়ে গেছে। আর আলোচনা তখনই হতে পারে যখন ভারত তার সৈন্য ডোকলাম থেকে প্রত্যাহার করবে। চীন কোনোমতেই ডোকলাম থেকে তার সৈন্য সরিয়ে নেবে না বলে ঘোষণা করে।

চীনের এই আধিপত্যবাদের মনোভাব আন্তর্জাতিক স্তরে সমালোচিত হয় এবং নিন্দার ঝড় তোলে। আমেরিকা ও জাপান সরকারি ভাবে বিবৃতি দিয়ে ডোকলামে বেজিং-এর আধিপত্যবাদের নীতিকে কড়া ভাষায় নিন্দা করে। রাশিয়াও চীনের অবস্থানকে 'অযৌক্তিক' বলে আখ্যায়িত করে। ইরানের মতো একটি দেশও চীনকে তার সৈন্য প্রত্যাহার এবং ত্রিদেশীয় সীমান্তে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার আহ্বান জানায়। সবাই প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভূমিকাকে 'অত্যন্ত সংযত ও মার্জিত' বলে ভূয়সী প্রশংসা করে। জাপানের মনোভাব ছিল সবচেয়ে কড়া ও স্পষ্টভাষিতায় ভরা। জাপানের মত হলো 'ভুটানের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে ভয় দেখিয়ে তার ভূখণ্ড জবরদখল করার পাঁয়তারা ভারত যেভাবে ভেস্তে দেয় তার জন্য ভারতকে সাধুবাদ জানানো উচিত।'

আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে বেজিং যে দিল্লির চালে ক্রমশ একঘরে হচ্ছে এবং বিশ্বের জনমত যে ক্রমশ তাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তা চীন বুঝতে পারে বেশ দেরিতে। কিন্তু যে সম্ভাবনা চীনকে খুবই আতঙ্কিত করে তোলে তাহলো জিয়ামেনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আসন্ন ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন যদি মোদী বয়কট করেন তাহলে পাঁচদেশীয় সম্মেলনটি শুধু গুরুত্বহীনই হয়ে পড়বে না, ওই জোট ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। আর তার দায়দায়িত্ব চীনের ওপরই বর্তাতো।

চীনের আরও অনেক ভয়ের কারণ ছিল। যার মধ্যে অন্যতম হলো— ভারত যদি চীনের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে, তাহলে বেজিং ভারতের বিশাল বাজার হারাবে যার ধাক্কা চীনের অর্থনীতির ওপর পড়বে। এমনিতে জাপানের প্রযুক্তি যেভাবে ভারতের বাজার দখল করছে তা চীনের জন্য অশনি সংকেত। যেমন চীনের বুলেট ট্রেনের প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও ভারত এ ব্যাপারে জাপানি প্রযুক্তিকেই বেছে নিয়েছে। ভারতীয় রেলকে জাপান তার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে ঢেলে সাজাতে চলেছে।

তাছাড়া আসন্ন ১৯তম চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসেও রাষ্ট্রপতি জিং জিন পিংকে কঠোর সমালোচনার মুখে পড়তে হতো। যে কারণে দলের ও দেশের নেতৃত্ব বদলও হতে পারতো। সুতরাং অবস্থা বেগতিক বুঝে চীন ভারতের সঙ্গে আপোশ রক্ষায় সম্মত হয়। মাত্র তিন ঘণ্টা বৈঠকের পর চীন ভারতের প্রস্তাবিত সমাধান সূত্র মেনে ডোকলাম থেকে সেনা প্রত্যাহারে রাজি হয়।

ডোকলাম অভিজ্ঞতা থেকে ভারত অনেক কিছু শিখেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় ব্যাপারটি হলো ভারত চীনের কাছে মাথা না নুইয়ে তার হৃত আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা ফিরে পেয়েছে। এশিয়ায় চীনের তুলনায় শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্র হিসেবে ভারত আত্মপ্রকাশ করেছে। দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয়টি হলো চীনকে কখনো বিশ্বাস না করা এবং দেশটিকে বন্ধু দেশ হিসেবে গণ্য না করা। বেজিং দিল্লিকে সবসময় নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু দেশ বলে ভাবে। ভারতকে সর্বোতভাবে দুর্বল করে খণ্ডিত করাই হলো তার মূল লক্ষ্য। জি জিন পিং যতই মুখে মোদীকে আশ্বাস দিন 'ভবিষ্যতে ডোকলামের পুনরাবৃত্তি হবে না' তবু চীনকে বিশ্বাস নেই।

কারণ ভারত চীনের আঁতে যেভাবে ঘা দিয়েছে তা চীন কোনোদিনই ভুলবে না। সময় সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে। সুতরাং ভারতকে চীনের বিরুদ্ধে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ চীন হলো এক নয়া সম্প্রসারণবাদী, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। ব্রিটিশদের মতো চীনারাও কখনো চতুরতা আবার কখনো যুদ্ধের মাধ্যমে বিদেশি ভূখণ্ড গ্রাস করে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে বদ্ধপরিকর। এটাই এখন কমিউনিস্ট চীনের আন্তর্জাতিক পরিচয়। ■

শরতে শারদা দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী অকাল বোধন

মৃণাল হোড়

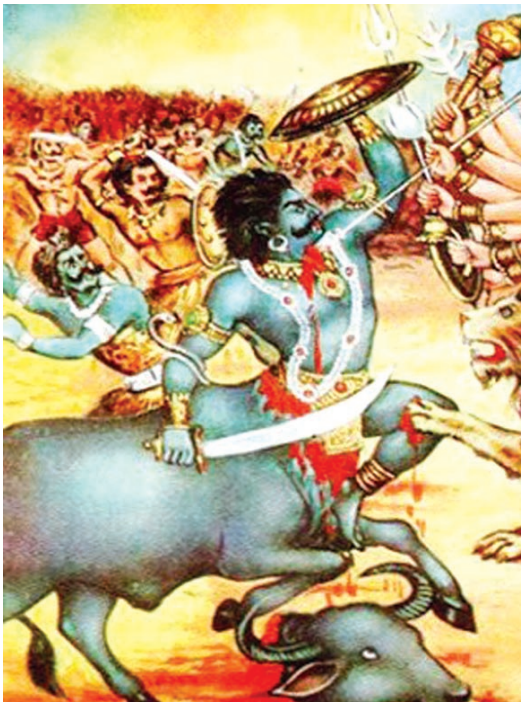

আশ্বিনের দুর্গোৎসব যদি অকাল বোধন হয় তবে, কালের বোধন কোনটা? অনেকে ইঙ্গিত করেন চৈত্র মাসের বাসন্তী উৎসবের দিকে। চৈত্র মাসে বাসন্তী পুজো হয় বটে, কিন্তু সে পুজোয় তো বোধনই নেই। কালী, কাত্যায়নী, হৈমন্তী, জগদ্ধাত্রী পুজোতেও বোধন নেই— অধিবাস আছে মাত্র। সত্য কথা, বোধন অর্থে জাগরণ। অকাল বোধন বলতে অসময়ে জাগরণ বোঝায়। বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদের গাত্রোত্থানের সময় চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী বিসর্জনের পরবর্তী উত্থান একাদশী তিথিতে। এই তিথিই হচ্ছে কালের বোধন। কিন্তু অসময়ে দুর্গাকে জাগানো হয় বলেই আশ্বিনের বোধনকে অকাল বোধন বলে।

বলা বাহুল্য, আশ্বিনেই মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিতে দুর্গোৎসবের যথার্থ সময়। শরৎ ঋতুতে এই উৎসব হয় বলে কেউ কেউ একে 'শারদীয় দুর্গোৎসব' বলে। কিন্তু দুর্গার এক নাম হচ্ছে 'শারদা'। 'শরদ' অর্থে জ্ঞান, 'শারদ' অর্থে জ্ঞানী, 'শারদা' স্ত্রী লিঙ্গবাচক শব্দ। আশ্বিনের সিতসপ্তমী ছাড়া অন্য সময়ে মহিষাসুরমর্দিনী বিগ্রহে দুর্গোৎসব হতেই পারে না। কারণ, অন্য সময়ে মহিষাসুরকে পাওয়া যায় না। চৈত্রে সপরিবার হর-গৌরীর পূজা প্রশস্ত। মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তির দুই দিকে গণেশ-কার্তিক-লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিগ্রহ বসানো শ্রীশ্রী চণ্ডীদ্বেষণা মাত্র। মহিষাসুর মর্দনে এই চারজনের কোনোই ভূমিকা নেই। তবে মহিষাসুরমর্দিনী বিগ্রহের দুই দিকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-পঞ্চানন-ইন্দ্র-অগ্নি- পবন থাকতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে আপত্তি থাকতে পারে না।

শ্রীরাম-কর্তৃক অকাল বোধন কৃত্তিবাসের কথা মাত্র। সংস্কৃত রামায়ণে রাম-কর্তৃক মহিষাসুরমর্দিনী পুজোর কথা নেই, আশ্বিনে অকাল বোধন তো দূর অস্ত। একথা সত্য, শ্রীশ্রী চণ্ডীতে সুরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্য-কর্তৃক মহিষাসুরমর্দিনী পুজোর কথা আছে। কিন্তু কোন ঋতুতে তার কোনো উল্লেখ নেই। যেহেতু অন্য ঋতুতে মহিষাসুরমর্দন হয়নি সেহেতু সুরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্য আশ্বিনেই মহিষাসুরমর্দিনী বিগ্রহে দুর্গোৎসব করেছিলেন। যদিও এই পুজো ঋগ্বেদীয় যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। এই বিষয়ে আলোকপাত পরে করব। তার আগে খুঁজে বের করতে হবে সুরথ ও সমাধি কোথায় বোধন করেছিলেন? সুরথ ও সমাধি মহিষাসুরমর্দনের কথকতা শুনেছিলেন— দেখেননি। যে আশ্রমে বসে কথা শুনেছিলেন বোধন সেই আশ্রমেই হয়। আশ্রমটি পুষ্পভদ্রা নদীর কূলে বালুকাময় ভূমিতে। পুষ্পভদ্রা নামে নদী কোথায়? এই নামে নদী আছে হিমালয় পর্বতমালার পশ্চিম অংশে। পুজো শেষে সুরথরাজা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু এই পুষ্পভদ্রা নামে নদী-অঞ্চলে অশ্বপৃষ্ঠে গতায়াত চলে না। ভারতের তুঙ্গভদ্রা নদীর কথা সবাই জানে, কিন্তু পুষ্পভদ্রা নামে নদী কি ছিল বা আছে? ভারতবর্ষে একই নামে একাধিক নদীকে পাওয়া যায় বলেই এই প্রশ্ন উঠছে। যমুনা নামে গোটা পাঁচেক নদীর কথা পাওয়া যায়। সরস্বতী নামে গোটা দুই তো আছেই। আবার অলকানন্দা নামেও গোটা দুই নদী তো বটে। ঐতিহাসিক সুধীর কুমার মিত্র বর্তমান কুন্তী তথা কানা নদীর পূর্ব নাম লিখেছেন 'পুষ্প শিপ্রা' নদী। কিন্তু এই নাম ঠিক মনে হয় না। মধ্যভারত অঞ্চলের শিপ্রা নদীর কথা সকলের জানা। যমুনা- সরস্বতী-অলকানন্দা হিমালয়াগত নদী। তাই মনে হয়, কুন্তীর নামই পুষ্পভদ্রা। (নবদ্বীপ অঞ্চলে অলকানন্দা, ত্রিবেণী ক্ষেত্রে হুগলী জেলায় সরস্বতী এবং চব্বিশ পরগণায় যমুনা।) তাই কুন্তীর মোহনায় ত্রিবেণী অঞ্চলেই ঋষির আশ্রম থাকা স্বাভাবিক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর বর্ণনা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি। এই স্থান হতেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে সুরথ রাজা নিজ রাজধানীতে ফিরে যান। রাজধানীর নাম 'কোলা'। দামোদর প্রবাহ পথে বর্তমান বর্ধমানের একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। অতীতে বর্ধমান নগরটি ছিল অস্থিক গ্রামে। চণ্ডীর বর্ণনায় কোলা রাজধানী যবন কর্তৃক অধিকৃত হয়। পুষ্পপুর তথা কুসুমগ্রাম কিন্তু যবন কর্তৃক অধিকৃত হয়নি। যবনেরা কোলা অধিকার করে নাম দিয়েছিল পার্থেনিস। নামটি যে পার্থিয়ান গ্রীক যবনদের দেওয়া তা সহজেই বোঝা যায়। গ্রিক যবন আলেকজাণ্ডার বৃহৎবঙ্গে আসেননি। এসেছিলেন মনেন্দার। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন সুরথের বাড়ি গৌড়

এবং সমাধির বাড়ি ছাটিগ্রাম অর্থাৎ চট্টগ্রামে। কিন্তু এই তথ্য ঠিক মনে হয় না। গ্রীক যবন কর্তৃক গৌড় দখল হয়নি। তাছাড়া গৌড় কোনো প্রাচীন শহর নয়। বারেন্দ্রে প্রাচীন শহর হচ্ছে পৌণ্ড্রবর্ধন। সমাধি বৈশ্যের বাড়ি চট্টগ্রামের বদলে সপ্তগ্রামে হওয়াই সম্ভব। ত্রিবেণী নতুন কোনো শহর নয়, প্লিনির ভ্রমণ কথায় এই নামটি আছে, যদিও সোনারগাঁও অঞ্চলে আর একটি ত্রিবেণী আছে।

ঋগ্বেদে অহনা দেবীর উল্লেখ আছে। এই অহনা হলেন ঊষা দেবীর নামান্তর। ঊষা দুই প্রকার। পার্থিব ঊষা বা নিত্য ঊষা, অন্যটি হলেন দৈবী ঊষা। ঊষাকে দক্ষিণা ঊষা বলা হয়েছে ঋগ্বেদের ১/১২৩/১-৪ ঋকে। গ্রিকগণের অথিনা এবং হিন্দুদের অহনা একই দেবী। গ্রিস দেশে গ্রিকগণের মধ্যে সিংহবাহনা মহিষাসুরমর্দিনী প্রত্নতত্ত্বের কোদালে উঠে এসেছে। তবে, এই গ্রিক কিন্তু আলেকজণ্ডার-মনেন্দারের সময়কার গ্রিক নয়, আরও দেড়-দুই হাজার বৎসর আগেকার গ্রিক, পারস্যরাজ দারাউসের চাইতেও অধিক প্রাচীন যুগের মানুষ। এই দক্ষিণায়ণ কালের ঊষা অহনা দেবীই হলেন পরবর্তীকালের দশভূজা দুর্গা এবং সুরথ-সমাধি কর্তৃক পূজিতা। ঊষা নিজে জাগ্রতা হয়ে দ্বিপদ-চতুষ্পদ জঙ্গম ও দেবতাগণকেও জাগরিত করেন। প্রাচীন ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরে শ্রীশ্রী চণ্ডী রচিত হয়েছে গুপ্ত যুগে। মনে রাখতে হবে, এই দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী কিন্তু কুমারী--- বিবাহিতা ও বাগ্‌দত্তা নহেন। দেবীর পূজায় সাত সমুদ্রের জল ব্যবহার হয় মহাস্নানে। দুধ-দই-ঘৃত-মধু-লবন-চিনি-ইক্ষুরস এই সাতটিকে জলে মিশ্রিত করলে সপ্তসমুদ্রোদক হয়। প্রাচীন যুগে তো সাবান ছিল না, তখনকার মানুষেরা সরিষার খৈল ও মাটি দিয়ে কেশ-গাত্র-মার্জন- প্রক্ষালন করত। দেবীর মহাস্নানে নববিধ মাটি লাগে, তন্মধ্যে বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা একটি। এখানে বেশ্যা অর্থে গণিকা মোটেই না। 'বি' অর্থে বিশেষ, 'শী' অর্থে বিদ্বান, 'বি' যোগ 'শী' অর্থ বিশেষ বিদ্বান বা বিশেষজ্ঞ। বিশেষ বিদ্বান বা বিশেষজ্ঞ। আ-কার অন্তঃ স্ত্রী লিঙ্গে বেশ্যা শব্দ নিষ্পন্ন হয়। অতএব এখানে বেশ্যা অর্থে বিদূষী-পণ্ডিত-বিশেষজ্ঞা-বিদ্যাবতী। তবে, বেশ্যা অর্থে সুবেশা রমণী-গৃহ-আকন্দ প্রভৃতি, বৃক্ষ-গণিকাও হয়। তন্ত্রে সাতপ্রকার বেশ্যার বর্ণনা আছে। রাজবেশ্যা-দেববেশ্যা-ব্রহ্মবেশ্যা-মহাবেশ্যা-ভববেশ্যা-কুলবেশ্যা। এই সপ্তপ্রকার বেশ্যার বর্ণনা দিয়ে আগম তন্ত্র বলছে— ''বিধাভবেদ্বেশ্যা ন বেশ্যা কুলটা প্রিয়ে। কুলটা সঙ্গমাদ্দেবী রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।।'' অর্থাৎ গণিকাগমন আর নরকগমন সমান। আমরা নিত্য দিন দেখছি, সূর্যোদয়ের চব্বিশ মিনিট আগে ঊষার আবির্ভাব। ঊষার আগে অশ্বিদ্বয়ের আবির্ভাব। অশ্বিদ্বয়ের আগে মহারুদ্রের আবির্ভাব, ইনি দেবাদিদেব মহাদেব। এখানে বিষ্ণু উত্থানের এক মাস আগে ঊষার আবির্ভাব ঊষার (দক্ষিণা ঊষা) পক্ষে অকাল নয়— কাল। যদিও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার পক্ষে অকাল। মনে রাখতে হবে মহিষ অর্থে এখানে দৈবরাত এবং মহিষাসুর হচ্ছেন জমজমাটি মেঘ। গ্রিকদের মহিষাসুর মহিষের (পশু) যোনী ভেদ করে বেরিয়েছে। আসলে দৈবী রাতের পৃশ্নী হলেন এই মহিষ যোনী। মূর্তিটি দেখনদার এবং প্রতীক মাত্র। অতি সাধারণ রূপকের মাধ্যমে বর্ষার বর্ণনা। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। বর্ধমানে সুরথগড় বলে একটি জায়গা আছে যা মঙ্গলকোটের ন্যায় হরপ্পা সভ্যতার ঐতিহ্য বহন না করলেও প্রাচীনতায় কম কিছু যায় না। সুরথ নামে একজন বিখ্যাত রাজা যে ওই অঞ্চলে ছিলেন তা অবশ্য বোঝা যায়।

ঋগ্বেদ মতে নিত্য ঊষার চরণ নেই। কিন্তু অহনা দৈবী ঊষার চরণ আছে। শ্রীশ্রী চণ্ডী গ্রন্থের অন্য নাম 'সপ্তশতী'। এই 'সপ্তশতী' গ্রন্থের পাঠক ও মহিষাসুরমদিনী দুর্গা পূজার উত্তম অধিকারী হলেন 'সপ্তশতী' ব্রাহ্মণ। এই সপ্তশতী ব্রাহ্মণ বৃহৎবঙ্গ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যত্র ছিল না হাজার বৎসর আগেও। তবে, কনৌজিয়াদের দাপটে সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। ''পঞ্চগোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, এই ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই। যদি থাকে দুই চার ঘর, সপ্তশতী পরাশর।'' এই হচ্ছে কনৌজিয়াদের বক্তব্য। তবে, কনৌজিয়া আগমনের পূর্বেও বৃহৎবঙ্গে বিস্তর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁরা যাগযজ্ঞ করতেন। যজ্ঞার্থে ভূমিদানের তাম্রপট্ট পাওয়া গিয়েছে যা কনৌজিয়া আগমনের পূর্বকার ঘটনা। আগেই বলেছি, সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা মহিষাসুরমর্দিনী পুজোর উত্তম অধিকারী তবে, পরাশরদের কী কাজ ছিল? আমার অনুমান, নব্যপরাশর বিধি নিয়েই এরা কালক্ষয় করতেন। যা হোক, মহিষাসুরমর্দিনী অহনা দেবীর উল্লেখ ঋগ্বেদে থাকলেও অহনা পুজোর কাল ও পুজোপদ্ধতি ওই গ্রন্থে নেই। তবে, মহিষাসুরের আবির্ভাব ও দক্ষিণা ঊষা তথা অহনা দেবীর অভ্যুদয় বিবেচনা করে শরৎ ঋতুতে আশ্বিন মাসের শুক্ল ষষ্ঠী সপ্তমী-তে শারদা দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনীর পুজোকে সঠিক কালের জাগরণ তথা বোধনই বলা যায়। কেননা, ঊষা নিজে জাগরিতা হয়ে অন্য দেবতাদের জাগরিত করেন।

গেরুয়া বিপ্লবের মাধ্যমেই ‘বিদ্যুৎ চোরেরা’ বিদ্যুৎ চাষি হয়ে উঠতে পারে

সাধন কুমার পাল

সবুজ বিপ্লব, শ্বেত বিপ্লবের পর কি এবার গেরুয়া বিপ্লব? ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণের দু’ সপ্তাহ পর এক ভাষণে নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, দেশে এবার গেরুয়া বিপ্লব আনতে হবে যা কিনা অচিরাচরিত শক্তির মাধ্যমে দেশকে স্বনির্ভর করবে। একথা বলেই তিনি উল্লেখ

করেছিলেন ‘আমার মুখে গেরুয়া কথাটি শুনে অনেকেই হয়তো সতর্ক হয়ে যাবেন। কিন্তু গেরুয়া হচ্ছে শক্তির প্রতীক।’ এই বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে গুজরাটের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া ও অচিরাচরিত শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ওই রাজ্যে যে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও তিনি সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে একই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চান। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার শক্তি ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন করছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে ভারতে পেট্রোল ডিজেলের ব্যবহার ইতিহাস হয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

‘বিদ্যুৎ চাষ’ শব্দটি শুনে অনেকেই হয়তো চমকে উঠবেন। না, এটা খ্যাতি তাড়িত কোনো অভিনব বিনোদন বা বিলাসিতার গল্পের নয় বরং এক চমকপ্রদ বাস্তবের শিরোনাম। গুজরাটের খেড়া জেলার ধুন্ধি গ্রামের ছয়জন ক্ষুদ্র কৃষক যৌথভাবে চাষের ফসল হিসেবে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিক্রয় করে সর্বপ্রথম ৩৬০০৫ টাকা আয় করেছেন। শুরুটা হয়েছিল এই গ্রামেরই কৃষক রমন পরমারের কৃষি জমিতে সেচের কাজে ব্যবহৃত ডিজেল পাম্প বিকল হয়ে যাওয়ার পর থেকে। ডিজেল পাম্পের বিকল্প খুঁজতে গিয়ে রমন পরমার ‘অন্তরাষ্ট্রীয় জল প্রবন্ধন সংস্থার’ সহায়তায় সোলার পাম্প লাগাতে সমর্থ হন। এতে শুধু যে ওঁর ১২ বিঘা জমিতে সেচের জন্য রোজ ৫০০ টাকার ডিজেলের খরচ বেঁচেছে এমনটা নয়, সেই সঙ্গে প্রতি মাসে ৪৫০০ টাকা আয় হতে শুরু করেছে। আয় শুরু হওয়ার কারণ ওই কৃষকের সোলার প্যানেলের একটি সরবরাহ লাইন মিটারের মাধ্যমে সরকারি বিদ্যুৎ বন্টন লাইনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই লাইনের মাধ্যমে সেচের কাজ হয়ে যাওয়ার পর সৌর প্যানেলের মাধ্যমে উৎপাদিত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরকারকে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়। সরবরাহকৃত বিদ্যুতের হিসেব ওই মিটারেই নথিভুক্ত হতে থাকে। প্রতি ইউনিট হিসেবে সরকারের কাছে বিক্রিত বিদ্যুতের মূল্য হিসেবে রমন পরমার মাসে ৪৫০০ টাকা পেতে শুরু করে।

এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে রম পরমার অন্য পাঁচজন ছোট কৃষক মিলে ‘ধুন্ধি সোলার উর্জা উৎপাদক সহকারী মণ্ডলী লিমিটেড’ নামে এক সোলার কো-অপারেটিভ গঠন করে ৫৬.৪ কিলোওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এক বড় সোলার স্টেশন তৈরি করে। এতে নিজেদের সেচের কাজ করে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরকারি পাওয়ার গ্রিডের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা হয়। রমন পরমারদের এই কো-অপারেটিভ ‘মধ্য গুজরাট ভিজ কোম্পানি লিমিটেডের’ সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী ২৫ বছরের জন্য এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তি অনুসারে সরকার কৃষকদের উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রতি ইউনিট ৪.৬৩ টাকা হিসেবে মূল্য দেবে। ২০১৬ সালের ১০ মে থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত এই সংস্থার সদস্যরা নিজেদের কৃষি জমিতে সেচের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ৫,০৯৭ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সর্বপ্রথম ৩৬০০৫ টাকা আয় করেছেন।

হিসেব বলছে ৫,০৯৭ ইউনিট বিদ্যুৎ বিক্রয়ের ফলে বন্ধ হয়েছে অতিরিক্ত ২৫ মিলিয়ন লিটার ভৌম জলের উত্তোলন এবং সেই সঙ্গে এই প্রকল্প শুরুর আগে যে ডিজেল চালিত পাম্প ব্যবহৃত হতো তা বাতিল হওয়ায় বন্ধ হয়েছে বায়ুমণ্ডলে ১.৬ টন কার্বন নিঃসরণ। সন্দেহ নেই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এই প্রকল্প এক যুগান্তকারী পদক্ষেপের সূচনা করেছে।

উদ্যোক্তাদের প্রত্যাশা প্রতি বছর ওরা ৬০,০০০ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। গুজরাটের আনন্দ জেলা ভিত্তিক অর্থনীতিবিদ, জল ব্যবস্থাপন বিশেষজ্ঞ ও কলম্বো ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো তুষার শা-এর বক্তব্য হলো, যে কৃষকরা মাসে ৬/৭ হাজার টাকা রোজগার করতেন তারা যদি বিদ্যুৎ বেচে মাসে অতিরিক্ত চার হাজার টাকা আয় করতে পারে এটা একটা বড় ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, তুষার শা হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি সামনে থেকে 'ধুন্ধি সোলার উর্জা উৎপাদক সহকারী মণ্ডলী লিমিটেড'কে বাস্তব রূপ দিতে সব রকম ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আমেরিকান অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ জেরিমাই কিবতিন (Jeremy Rifkin) বলেছেন, 'India is the Saudi Arabia of renewable energy sources and if properly Utilised, India can realise its place in the world as a great power'। অচিরাচরিত শক্তি ক্ষেত্রে এই বিপুল সম্ভবনার কথা মাথায় রেখেই বর্তমান নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিক্ষেত্রে ভারতকে বড় শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কিছু লক্ষ্য স্থির করেছে ও লক্ষ্যপূরণে ইতিমধ্যেই কিছু নীতি প্রণয়ন করেছে। যেমন, কেন্দ্রীয় সরকার ২০২২ সালের মধ্যে ১৭৫,০০০ মেগাওয়াট অচিরাচরিত শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা, সোলার প্রোজেক্টগুলিতে ১০ বছরের জন্য কর ছাড় ও ৩০ শতাংশ ভরতুকি, ১০০টি স্মার্ট সিটিতে অচিরাচরিত শক্তি উৎপাদনের কারিগরি ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় জাহাজ ও রেল মন্ত্রণালয় বায়ুশক্তি ও সৌরশক্তির মাধ্যমে শক্তির চাহিদা পূরণের বড় লক্ষমাত্রা রেখেছে। নতুন দিল্লিতে আয়োজিত সি আই আই-এর ২০১৭ সালের বার্ষিক সভায় কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রী পীযুষ গোয়েল জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার স্বনির্ভর বৈদ্যুতিন গাড়ি বাজারে আনতে চাইছে। ২০৩০ সালের মধ্যে যাতে একটিও পেট্রোল বা ডিজেল চালিত গাড়ি বাজারে বিক্রয় না হয় এই লক্ষ্য নিয়েই এগোতে চাইছে সরকার। বিদ্যুৎ চালিত গাড়ি শিল্পকে উৎসাহ দিতে সরকার প্রথম দিকে ২-৩ বছর আর্থিক সহায়তা দেবে। কেন্দ্রীয় ভারি শিল্পমন্ত্রক ও নীতি আয়োগ কমিটি এ ব্যাপারে নাকি কাজ শুরু করে দিয়েছে। দাম কম ও খরচ সাশ্রয় হলে ক্রেতারা স্বাভাবিক ভাবেই এই ধরনের বিদ্যুৎচালিত গাড়ির দিকেই ঝুঁকবেন। সন্দেহ নেই বাজারে এই ধরনের গাড়ি এসে গেলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচবে।

এ রাজ্যেও গ্রামীণ ক্ষেত্রে সোলার পিভি প্রোগ্রাম, সোলার থার্মাল প্রোগ্রাম, ব্যাটারি চালিত গাড়ি প্রকল্পকে উৎসাহ দেওয়ার মতো নানা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি মন্ত্রকের অধীন পশ্চিমবঙ্গ পুনর্নবীকরণ-যোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা বিভিন্ন স্কুল ও কলেজগুলোতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় ঘটাতে সৌর বিদ্যুৎ বসানোর কাজে হাত দিয়েছে। বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে যে এতে নব্বই শতাংশ বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা যাচ্ছে। এই সব স্কুলে সৌরবিদ্যুৎ বসানোর আগে হাজার হাজার টাকা বিদ্যুৎ বিল আসছিল। এখন তা প্রতীকী বিল হিসেবে মাসে মাত্র তিনশো থেকে পাঁচশো টাকায় ঠেকেছে। এই ব্যবস্থায় সোলার সিস্টেমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ গ্রিডে পৌঁছে যাবে। আর প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে যে বিদ্যুৎ ওই প্রতিষ্ঠান খরচ করবে, তার থেকে উৎপাদিত সৌর বিদ্যুতের বিয়োগফল, প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ খরচ বাবদ পেমেন্ট করতে হবে। এই ব্যবস্থাকে বলে নেট মিটারিং সিস্টেম।

শোনা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের সেচের জন্য সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্প বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই পদক্ষেপ সফল হলে কমে আসবে কৃষকদের সেচের খরচ। খরচ কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে জলোত্তোলনের প্রবণতা। সঙ্কটাপন্ন হবে ভৌম জল ভাণ্ডার। যা কিনা পরিবেশের উপর ভয়ানক প্রভাব ফেলবে। কারণ এ রাজ্যে ভৌম জল ভাণ্ডার আশঙ্কাজনক ভাবে কমে আসছে। এক সময় যে সমস্ত জায়গায় এক সময় দশ পনেরো ফুট মাটি খুঁড়লেই জল পাওয়া যেতো এখন সেখানে পঞ্চাশ ফুট খুঁড়লেও জল মেলে না।

ভারত সরকার গৃহীত কর্মসূচি বলছে, আগামী দিনে অচিরাচরিত শক্তিকে কেন্দ্র করে শিল্প ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এক নতুন জোয়ার আসতে চলেছে। অচিরাচরিত শক্তির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গেও বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে সরকারি প্রকল্পের মোড়ক থেকে বের করে প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান এবং বাণিজ্যিক ভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সূর্য এ রাজ্যকে বঞ্চিত করেনি। এখানে বছরে ৩০০ দিনেরও বেশি উজ্জ্বল সূর্যালোক পাওয়া যায়। ফলে এখানে সৌর বিদ্যুতের সাহায্যে সেচ সেই সঙ্গে ধুন্ধি সোলার উর্জা উৎপাদক সরকারি মণ্ডলী লিমিটেডের মতো সমবায়ের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ছাদেও সৌরবিদ্যুতের সাহায্যে প্রত্যক্ষ আয়ের প্রকল্পে উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। নেট মিটারিং পলিসির মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিক্রয় করে যাতে প্রত্যক্ষ আয় হতে পারে সেই লক্ষ্যে নতুন নীতি প্রণয়ন করতে হবে। এতে শক্তিক্ষেত্রে শিল্প ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমে আসবে শক্তির অপচয়, নিয়ন্ত্রণে আসবে পরিবেশ দূষণও। পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গাতেই বিদ্যুৎ চুরি, বিদ্যুতের বিল অনাদায় একটি বড় সমস্যা। শোনা যাচ্ছে রাজ্য সরকার ওই সমস্ত সমস্যা সঙ্কুল এলাকায় বেসরকারি হাতে বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থা তুলে দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে চাইছেন। এই ব্যবস্থা কতখানি কার্যকর হবে তাই নিয়ে সংশয় আছেই। তবে 'বিদ্যুৎ চোরেদের' বিদ্যুৎ চাষি হিসেবে গড়ে তুলে এই সমস্যার সমাধানের পথ খোঁজা যেতে পারে। সবমিলে বলা যায় গেরুয়া বিপ্লবের মাধ্যমে এই রাজ্যের কর্মসংস্থান, শিল্পায়নের মতো অনেক বড় বড় সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। ■

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

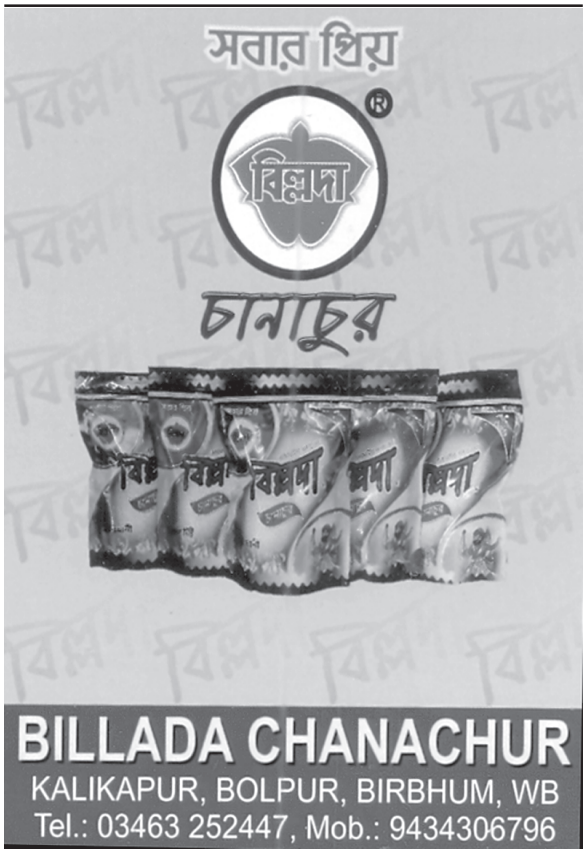

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

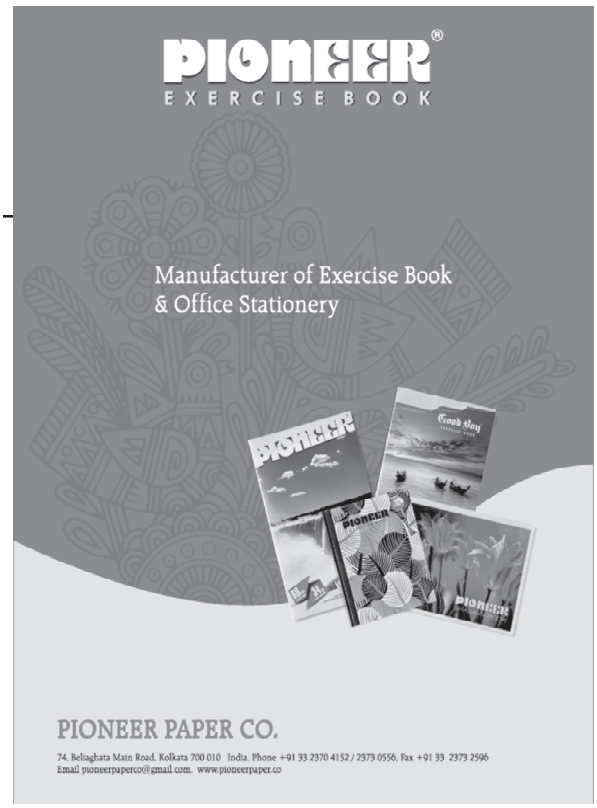

চীনের অর্থনৈতিক আগ্রাসন ভারতের শিরঃপীড়া

অম্লানকুসুম ঘোষ

কোনও মানুষের শান্তিশৃঙ্খলা যেমন অনেকাংশে নির্ভর করে তার প্রতিবেশীর আচরণের ওপর, সেরকমই কোনও দেশের শান্তিশৃঙ্খলা অনেকাংশে নির্ভর করে তার প্রতিবেশী দেশের আচরণের ওপর। প্রতিবেশী দেশ যদি আগ্রাসী মানসিকতার হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট দেশকে খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাতে হয়। বর্তমানে ভারতের ঠিক সেই অবস্থা হয়েছে। ভারতের বৃহত্তম প্রতিবেশী দেশ চীন তার আগ্রাসী মনোভাবের দ্বারা ভারতকে ক্রমাগত বিপদে ফেলে চলেছে। চীন ভারতের ওপর এই আগ্রাসন নানাবিধ পদ্ধতিতে চালাচ্ছে। তার মধ্যে প্রধানতম হলো অর্থনৈতিক আগ্রাসন। এই অর্থনৈতিক আগ্রাসন চালানো হচ্ছে সস্তা পণ্যের জোয়ারে ভারতের বাজারকে ভাসিয়ে দিয়ে। এর ফলে কী ক্ষতি হয় দেখা যাক। প্রথমত, চীনা পণ্যের বিক্রি বাড়ার সঙ্গে ভারতীয় পণ্যসমূহের বিক্রি হ্রাস পাচ্ছে। অর্থাৎ ভারতীয় পণ্য বাজার হারাচ্ছে, ফলে ভারতীয় শিল্প চাহিদার অভাবে ভুগছে। চাহিদা হ্রাসের ফলে শিল্পগুলিতে উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। ফলস্বরূপ কুটিরশিল্পের শিল্পী এবং বৃহৎ শিল্পের শ্রমিক উভয়ই বেকারত্বের শিকার হচ্ছে। তাদের উপার্জন এবং ক্রয়ক্ষমতা দুইই হ্রাস পাচ্ছে। তাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে অর্থনীতির অন্য দুই ক্ষেত্র কৃষি ও পরিষেবা চাহিদা হ্রাসের মুখে পড়ে। তাদেরও উৎপাদন হ্রাস করতে হয় ও কর্মী ছাঁটাইয়ের পথ ধরতে হয়। ফলে পুনরায় চাহিদা হ্রাস ও অর্থনীতির সবকটি ক্ষেত্রেই পুনরায় উৎপাদন হ্রাস ঘটে। ভারতীয় অর্থনীতি বেকারত্ব-ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস-চাহিদা হ্রাস- উৎপাদন হ্রাস-পুনরায় বেকারত্ব— এই রূপ পতনের এক চক্রে প্রবেশ করে। এখন দেখা যাক, বেকারত্বের শিকার হওয়া এবং ফলস্বরূপ উপার্জন থেকে বঞ্চিত হওয়া শ্রমিকদের মোট সংখ্যা কত এবং চীনা পণ্যের অনুপ্রবেশের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি বছরে ঠিক কত টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

শেষ আর্থিক বছরে চীন থেকে ভারতের আমদানি হলো ৬১.৮ বিলিয়ন ডলার বা চার লক্ষ বাইশ হাজার কোটি টাকার। এই আমদানি কাঁচামাল হিসেবে হয় না। পুরোটাই হয় নির্মিত বস্তু হিসেবে, অর্থাৎ এই বিপুল পরিমাণ পণ্য ভারতের বাজারে বিক্রি হওয়ায় ভারতীয় শিল্পসামগ্রী এই পরিমাণ বাজার হারালো বা ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের বছরে চার লক্ষ বাইশ হাজার কোটি টাকার চাহিদা হ্রাস হলো। এবং ভারতীয় শিল্পী ও শ্রমিকদের চার লক্ষ বাইশ হাজার কোটি টাকা উপার্জন হ্রাস হলো। শিল্পক্ষেত্রে হওয়া এই বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতির প্রভাব কিন্তু শুধু শিল্পক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এর পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে কৃষিক্ষেত্রে। শিল্পী ও শ্রমিকরা উপার্জনহীন হওয়ায় তাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে তারা কৃষিপণ্য কম কিনতে পারছে অর্থাৎ কৃষিপণ্যের চাহিদাও হ্রাস পাচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় কৃষকদের উপার্জন হ্রাস ঘটছে। চীনা পণ্যের ভারতীয় বাজার দখলের কারণে এই পরোক্ষ ক্ষতি হওয়া ছাড়াও কিছু প্রত্যক্ষ ক্ষতির সম্মুখীনও হচ্ছে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্র। কারণ চীনে তৈরি নকল চাল, নকল ডিমের মতো অনেক জিনিস ভারতীয় বাজারে ছেয়ে গেছে। বাইরে থেকে দেখে জিনিসগুলিকে ক্রেতারা আসলের থেকে আলাদা করতে পারেন না এবং শরীরের পক্ষে চরম ক্ষতিকর এইসব জিনিস কিনে ফেলেন। ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রও বাজার হারায়। নকল চাল ও নকল ডিমের মতো সামগ্রী বাজারে প্রবেশ করে চোরাপথে অর্থাৎ অনথিভুক্ত অবস্থায় তাই এইসব সামগ্রী বাজারে কত পরিমাণে বিক্রি হলো এবং তার ফলে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্র প্রত্যক্ষভাবে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হলো তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু পরোক্ষভাবে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। আগেই বলেছি যে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের উপার্জন হ্রাস ঘটেছে

ভারতের বদান্যতায় প্রাপ্ত ভেটো প্রয়োগের অধিকার চীন ভারতের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করেছে। যেমন নিউক্লিয়ার সাপ্লাই গ্রুপ (এনএসজি)-তে ভারতের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা এবং কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী মাসুদ আজহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ঘোষণা করতে বাধা দেওয়ার মাধ্যমে, সেরকমই ভারতীয়দের বদান্যতায় প্রাপ্ত অর্থসম্পদ চীন ভারতের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করছে।

মোট ৪.২২ লক্ষ কোটি টাকা। বর্তমান ভারতীয় অর্থনীতিতে যে-কোনও মানুষের সার্বিক ভোগব্যয়ের গড়ে প্রায় ৪০ শতাংশ কৃষিপণ্য বা কৃষিজাত পণ্য কেনার জন্য হয়। অর্থাৎ চীনা পণ্যের জন্য শিল্পক্ষেত্রের যে ৪.২২ লক্ষ কোটি টাকা উপার্জন হ্রাস ঘটছে তার পরোক্ষ ফলস্বরূপ বছরে ১.৬৮ লক্ষ কোটি টাকার (৪.২২ × ৪০/১০০) কৃষিপণ্যের বিক্রয়-হ্রাস ঘটছে। অর্থাৎ কৃষকসমাজের বছরে ১.৬৮ লক্ষ কোটি টাকার উপার্জন হ্রাস ঘটেছে। এই উপার্জন হ্রাসের ফলে আবার পরোক্ষভাবে শিল্পক্ষেত্রের বিক্রয় তথা চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে। কারণ যে-কোনও মানুষের সার্বিক ভোগব্যয়ের গড়ে প্রায় ৪০ শতাংশ যেমন কৃষিপণ্য বা কৃষিজাত পণ্য কেনার জন্য ব্যয় হয়, সেইরকমই যে-কোনও মানুষের সার্বিক ভোগব্যয়ের এক বড় অংশ শিল্পজাত পণ্য কেনার জন্যেও ব্যয় হয়। ভারতীয় অর্থনীতিতে এর পরিমাণ গড়ে প্রায় ৩৫ শতাংশ। অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে ১.৬৮ লক্ষ কোটি টাকা উপার্জন হ্রাসের ফলে পরোক্ষভাবে শিল্পক্ষেত্রের বিক্রি বা চাহিদা হ্রাস পেল ০.৫৮৮ লক্ষ কোটি টাকা (১.৬৮ × ৩৫/১০০)। অর্থাৎ শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিক ও শিল্পীদের এই বিপুল পরিমাণ উপার্জন- হ্রাস ঘটলো। এই উপার্জন হ্রাসের পর্বে পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতিতে বেকারত্ব ও কর্মহীনতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, শিল্পক্ষেত্রের এই উপার্জন-হ্রাস পুনরায় কৃষিক্ষেত্রের উপার্জন-হ্রাসের কারণ হয় এবং কৃষিক্ষেত্রের সেই উপার্জন-হ্রাস পুনরায় শিল্পক্ষেত্রের উপার্জন-হ্রাসের কারণ হয়। এভাবেই পরোক্ষভাবে শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেরই ক্রমান্বয়ে উপার্জন-হ্রাস ঘটতে থাকে। প্রত্যক্ষ ভাবে ঘটা উপার্জন- হ্রাস এবং পরোক্ষভাবে ঘটা প্রাথমিক উপার্জন হ্রাস পরিমাপযোগ্য হলেও পরোক্ষভাবে ঘটা পরবর্তী উপার্জন হ্রাস পরিমাপযোগ্য নয়। অর্থনীতিতে এর সুদূরপ্রসারী ক্ষতি দেখা যায়। এর প্রভাব শুধুমাত্র বর্তমান সময়ে আবদ্ধ থাকে না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও এই ক্ষতির ভার বহন করতে হয়। শিল্পক্ষেত্র ও কৃষিক্ষেত্র মিলিয়ে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রাথমিক ক্ষতির মোট পরিমাণ হলো (৪.২২ + ১.৬৮ + ০.৫৮৮) ৬.৪৮৮ লক্ষ কোটি টাকা। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রাথমিক ক্ষতির কিন্তু এখানেই শেষ নয়, শিল্পক্ষেত্র ও কৃষিক্ষেত্র উপার্জন-হ্রাসের শিকার হলে তার প্রাথমিক পরোক্ষ প্রভাব পড়ে অর্থনীতির তৃতীয় ক্ষেত্র পরিষেবা ক্ষেত্রের ওপর। যে-কোনও মানুষের সার্বিক ভোগব্যয়ের এক বড় অংশ শিল্পজাত পণ্য কেনার জন্য ব্যয় হয়। ভারতীয় অর্থনীতিতে এর পরিমাণ গড়ে সার্বিক ব্যয়ের প্রায় ১৫ শতাংশ।

অর্থাৎ ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে ও কৃষিক্ষেত্র যখন ৬.৪৮৮ লক্ষ কোটি টাকার উপার্জন হ্রাসের শিকার হচ্ছে তখন ভারতীয় পরিষেবা ক্ষেত্রও (৬.৪৮৮ × ১৫/১০০) ০.৯৭৩২ লক্ষ কোটি টাকার চাহিদা হ্রাসের অর্থাৎ সমপরিমাণ অর্থের উপার্জন-হ্রাসের সম্মুখীন হয়। পরিষেবা ক্ষেত্র এই পরিমাণ উপার্জন-হ্রাসের শিকার হলে তার প্রাথমিক পরোক্ষ প্রভাব পড়ে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের ওপর। পরিষেবা ক্ষেত্রে ০.৯৭৩২ লক্ষ কোটি টাকা উপার্জন হ্রাসের ফলে পরোক্ষভাবে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের বিক্রি বা চাহিদা হ্রাস পেল ০.৭২৯৯ লক্ষ কোটি টাকা { ০.৯৭৩২ × (৩৫ + ৪০)/১০০ }। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের এই উপার্জন হ্রাস আবার পরোক্ষভাবে পরিষেবাক্ষেত্রের উপার্জন হ্রাস এবং তার ফলে পুনরায় কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের উপার্জন হ্রাস। উপার্জন হ্রাসের পূর্বোল্লিখিত চক্রের দর্শন এক্ষেত্রেও পাওয়া যায়।

চীনা পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় অর্থনীতির প্রত্যক্ষ ক্ষতি হচ্ছে (৪.২২ + ১.৬৮ + ০.৫৮৮ + ০.৭২৯৯ + ০.৯৭৩২) ৮.১৯১১ লক্ষ কোটি টাকা। সীমাহীন পরোক্ষ ক্ষতি তো পরিমাপের অতীত, কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে চলতি বছরে হওয়া পরোক্ষ ক্ষতির পরিমাণ ধরা হয় প্রত্যক্ষ ক্ষতির ৫০ শতাংশ। অর্থাৎ চীনা পণ্যের অনুপ্রবেশের জন্য এক বছরে হওয়া পরোক্ষ ক্ষতির পরিমাণ ৪.০৯৫৫৫ (৮.১৯১১ × ৫০/১০০) লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিলিয়ে মোট ক্ষতির পরিমাণ ১২.২৮৬৬৫ (৪.০৯৫৫৫ + ৮.১৯১১) লক্ষ কোটি টাকা বা ১২ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৬৫ কোটি টাকা। এই অর্থ আমাদের এক বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটের সমান। আমাদের দেশে শিক্ষাখাতে বার্ষিক খরচ হয় চল্লিশ হাজার কোটি টাকা। চীনা পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় অর্থনীতির প্রত্যক্ষ ক্ষতি পরিমাণের দিক দিয়ে এর তিরিশ গুণ। আমাদের দেশে স্বাস্থ্যখাতে বার্ষিক খরচ হয় ছত্রিশ হাজার কোটি টাকা। চীনা পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় অর্থনীতির প্রত্যক্ষ ক্ষতি পরিমাণের দিক দিয়ে এর তেত্রিশ গুণ। আমাদের দেশে সামরিক খাতে বার্ষিক খরচ হয় প্রায় দু' লক্ষ চল্লিশ হাজার কোটি টাকা। চীনা পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় অর্থনীতির প্রত্যক্ষ ক্ষতি পরিমাণের দিক দিয়ে এর পাঁচ গুণ।

অর্থাৎ শুধুমাত্র সস্তার মোহে পড়ে চীনা জিনিস কিনে আমরা প্রতি বছর যে পরিমাণ অর্থ চীনের হাতে তুলে দিচ্ছি তা দিয়ে তিরিশ বছর ধরে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক ব্যয় বহন করা যেত। তেত্রিশ বছর ধরে দেশের স্বাস্থ্য খাতে হওয়া যাবতীয় সামগ্রিক ব্যয় বহন করা যেত এবং সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ পাঁচ গুণ বাড়ানো যেত। যার ফলে সামরিক বলে পাঁচ গুণ বলীয়ান হয়ে আমরা গোটা বিশ্বে অপরাজেয় হয়ে উঠতে পারতাম। এছাড়াও কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে এই ১২ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৬৫ কোটি টাকায় দশ কোটি লোকের কর্মসংস্থান হোত। এবং তাদের প্রত্যেকের মাসে ১০০০০ টাকা করে বছরে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা উপার্জন হতে পারতো। কিন্তু এসব কিছু হচ্ছে না শুধুমাত্র আমরা সস্তার মোহে পড়ে চীনা দ্রব্য কিনছি বলে।

চীনা পণ্যের জোয়ারে ভারতের বাজারকে ভাসিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে চীন ভারতীয় অর্থনীতির কী কী ক্ষতি করছে তা তো বোঝা গেল। কিন্তু ক্ষতির এখানেই শেষ নয়। দেশের অর্থনীতির ভয়ঙ্করতম অবস্থা দেখা যাবে ভবিষ্যতে। চীনা পণ্যগুলি তুলনামূলকভাবে সস্তা হয় কারণ চীনা পণ্যগুলি উৎপাদন খরচের চেয়ে কম মূল্যে ভারতের বাজারে পাঠানো হয়। অর্থাৎ ভারতে পাঠানো হয় সাময়িকভাবে ক্ষতি স্বীকার করে। সাময়িকভাবে এই ক্ষতি স্বীকারের পেছনে থাকে এক দীর্ঘমেয়াদী দুরভিসন্ধি। চীনের সস্তা পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়ে ভারতীয় কারখানাসমূহ বন্ধ হয়ে যাবে। কুটিরশিল্পের শিল্পীরাও অভ্যাসের অভাবে ধীরে ধীরে তাদের দক্ষতা হারাবে। ভারতবর্ষ

তখন বন্ধ শিল্পের এক শ্মশানভূমিতে পরিণত হবে।

ভারতীয় ক্রেতারা তখন সম্পূর্ণরূপে চীনের পণ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে আর সেই সময়ে ভারতীয় বাজারের ওপর সেই একচেটিয়া আধিপত্যের সুযোগ নেবে চীন। তখন তারা যে দাম চাইবে ভারতীয় ক্রেতাদের সেই দামেই কিনতে হবে চীনের সামগ্রী। অর্থনীতির পরিভাষায় এই অপকৌশলকে বলা হয় ডাম্পিং। এই ডাম্পিং-এর চূড়ান্ত অপপ্রয়োগ যদি অবিলম্বে রোধ করা না যায় তাহলে দেশের যে দুরবস্থা হবে, অনাগত সেই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ কল্পনাকেও হার মানায়।

ভারতের বদান্যতায় প্রাপ্ত ভেটো প্রয়োগের অধিকার চীন ভারতের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করেছে। যেমন নিউক্লিয়ার সাপ্লাই গ্রুপ (এনএসজি)-তে ভারতের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা এবং কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী মাসুদ আজহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ঘোষণা করতে বাধা দেওয়ার মাধ্যমে, সেরকমই ভারতীয়দের বদান্যতায় প্রাপ্ত অর্থসম্পদ চীন ভারতের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করছে। চীন যে চার লক্ষ বাইশ হাজার কোটি টাকা বাড়তি লাভ করছে ভারতের বাজার থেকে সেই অর্থের দ্বারা চীন নিজের এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে উন্নত করছে। তাদের জন্য অত্যাধুনিক অস্ত্র ক্রয় করছে এবং সেই অত্যাধুনিক অস্ত্রের বলে বলীয়ান চীনা এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ভারতের সীমান্তে হামলা করছে। আমাদের দেশের বীর জওয়ানদের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে।

চীনা দ্রব্য ব্যবহারের ফলে অর্থনীতির চরম ক্ষতি তো হয়ই কিন্তু এই ক্ষতি শুধুমাত্র অর্থনীতির সীমানায় আবদ্ধ নেই। পরিবেশও চরম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। কারণ এসব চীনা পণ্য সাধারণত ক্ষতিকর কিছু রাসায়নিকের দ্বারা নির্মিত হয় যা দামে সস্তা হলেও পরিবেশের ও ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। শুধুমাত্র ব্যবহারকালে নয় বরং ব্যবহারের পরে ফেলে দেবার পরও এই বস্তুগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে পরিবেশে মিশে যায় না। দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশে পড়ে থেকে পরিবেশকে বিষাক্ত করে। ফলে দেশের স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত হয়।

এর ফলে একদিকে যেমন দেশের কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায় অন্যদিকে সাধারণ নাগরিকের ও সরকারের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়।

কারও কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, চীনা জিনিস ব্যবহার করা যদি দেশের পক্ষে এতই ক্ষতিকর তাহলে সরকার চীনা জিনিস ব্যবহার আইন করে বন্ধ করে দিচ্ছে না কেন?

চীনা পণ্য বয়কটের দাবিতে চীনা পণ্য পোড়ানো হচ্ছে।

বর্তমানে বিশ্বায়নের পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে কোনও একটি বিশেষ দেশের সব পণ্য বিক্রি আইনত নিষিদ্ধ করা যায় না। ভারত চীনের সামগ্রী নিষিদ্ধ না করতে পারলেও কোনও পণ্য কেনা বা না কেনা তো সম্পূর্ণ ক্রেতার হাতে।

চীনা পণ্যে ভারতীয় বাজার ছেয়ে গেলেও চীনা পণ্য কিনবো কি কিনবো না সেই সিদ্ধান্ত তো সম্পূর্ণরূপে ক্রেতার নিজের। ক্রেতারা যদি চীনা পণ্য না কেনেন, তাহলে বিশ্বায়ন সংক্রান্ত আইনসমূহও চীনের পণ্যকে ভারতের বাজার দখল করার সুযোগ দিতে পারবে না। তবে ভারতের বাজার দখলে চীন যে ডাম্পিং নীতির সাহায্য নিচ্ছে তাও বিশ্বায়নের আইন বিরোধী এবং সরকার ডাম্পিং ডিউটিও বসিয়েছে। অর্থাৎ একথা বলা যায় যে, সরকারের কাজ সরকার করেছে, এবার মানুষকে মানুষের কাজ করতে হবে, চীনা পণ্যকে সর্বাত্মক ভাবে বয়কট করতে হবে। এখানে আরও একটি কথা স্মর্তব্য, জনসাধারণ জাগ্রত থাকলে সরকারও সচেতন থাকবে এবং চীনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে কখনও দুর্বলতা দেখাবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার হাতে আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হওয়ার পর জাপান বাধ্য হয়ে আমেরিকার অধীনতা স্বীকার করে। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কও স্থাপন করে। তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী এবং শিল্পের দিক দিয়ে সবচেয়ে উন্নত দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তার উৎপাদিত পণ্যের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছিল জাপানের বাজার। বোমাবিধ্বস্ত শিল্পহীন তৎকালীন জাপান সরকার আইনগত বাধ্যতার কারণে তার কোনও প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু জাপানের দেশপ্রেমিক নাগরিকেরা মার্কিন পণ্যকে সম্পূর্ণ বয়কট করেছিল। মার্কিন পণ্য জাপানের বাজারে পড়ে পড়ে নষ্ট হয়েছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার আপেল, যা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আপেল, তা জাপানের বাজারে পড়ে পড়ে পচেছিল। মার্কিন আপেল বিক্রেতারা প্রথমে সস্তা দরে, পরে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সেই আপেল বিলি করতে শুরু করেছিল। আপেলপ্রিয় জাপানিরা সেদিকে ফিরেও তাকায়নি। তারা বিনামূল্যে ক্যালিফোর্নিয়া-আপেল না খেয়ে নিজেদের দেশের তুলনামূলক নিম্নমানের আপেল কিনে খেয়েছে। যাতে নিজেদের দেশের আপেল উৎপাদনকারীদের বিক্রি বজায় থাকে এবং তাদের উপার্জন বন্ধ না হয়। দেশের প্রতি এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং কর্তব্যবোধ ছিল বলেই জাপান আজ আর্থিক দিক থেকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আমরাও যদি তাদের মতো দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারি তবেই 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' ■

চীনের গড়ে মোদীর হ্যাট্রিক

প্রণয় রায়

নবম ব্রিকস সম্মেলন ভারতীয় কূটনীতির ইতিহাসে স্বর্ণময় অধ্যায়। নিজের দেশে দাঁড়িয়ে, ভারতের চাপে চীন যে ভাবে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ঢোক গিলতে বাধ্য হলো তাকে বিশ্ব মিডিয়া ভারতের কূটনীতিক জয় হিসেবে দেখছে। যে ভাবে চীনের মাটিতে দাঁড়িয়ে ব্রিকস নেতারা পাকিস্তানের সন্ত্রাসী গোষ্ঠী লস্কর, জয়েশ-ই-মহম্মদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তাতে চীনা বন্ধু পাকিস্তানের অবস্থা বেকায়দায়। মুখ পুড়েছে চীনেরও, ব্রিকস ঘোষণাপত্রের ৪৮ তম অনুচ্ছেদে যে জয়েশ-ই- মহম্মদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে সেই জয়েশ কর্তা মাসুদ আজাহারকে বাঁচাতে বার বার সুরক্ষা পরিষদে চীন তার ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করেছে। ফলে এই ঘোষণাপত্র সুরক্ষা পরিষদে চীনের গুরুত্ব অনেকটাই কমিয়ে দিল বলে কূটনীতিক মহলের খবর।

ব্রিকস ঘোষণাকে বিশ্বের প্রায় সব দেশ স্বাগত জানালেও এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে চীন-বন্ধু পাকিস্তান। ফলে পাকিস্তানেও চীনের বিরুদ্ধে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এমনিতেই চীন-পাকিস্তানের অর্থনৈতিক করিডোর নিয়ে পাকিস্তানের মানুষ চীনের বিরুদ্ধে মুখ খুলছে। পাকিস্তানের মিডিয়ার ভাষায় প্রথমে আমেরিকা এবার চীনও ভারতের পক্ষে গেল। উল্লেখ্য, সম্মেলনের ঠিক আগেই আমেরিকার রাষ্ট্রপতি সরাসরি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন।

চীনে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত সুরেশ কে. গোয়েল, এই ঘোষণাপত্রকে ভারতের বড়সড় কূটনীতিক জয় হিসেবেই দেখছেন। এই ঘোষণাপত্র রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাকিস্তানের সন্ত্রাসীদের নিয়ে চীনকে অবস্থান বদল করতে বাধ্য করবে বলে মত প্রকাশ করেছেন স্ট্র্যাটিজিক বিশেষজ্ঞ রাজীব শর্মা। সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ পি কে মেহগাল বলেন, 'এটা ভারতের কূটনীতির জয়। ভারত চীনকে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে।' সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ কায়াম আগার মতে, 'এটা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কৃতিত্ব যে উনি সন্ত্রাসবাদকে সম্মেলনের প্রধান ইস্যু হিসেবে তুলে ধরতে পেরেছেন।'

কিছু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ এই ঘোষণাপত্রের সঙ্গে ডোকলাম ইস্যুতেও ভারতের কূটনীতির জয়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছেন। যে ভাবে ৭১ দিন পর্যন্ত দুই পরমাণু শক্তিধর দেশ ১৫০ মিটারের ব্যবধানে দাঁড়িয়েছিল তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। শীতযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে এর নজিরও কম। যে ভাবে ভারত লাল ফৌজের রাস্তায় পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশী ভুটানকে রক্ষা করেছে তাতে স্পষ্ট ২০১৭ আর ১৯৬২ এক নয়। যে ভাবে জাপান, আমেরিকা-সহ বহু দেশ প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে ভারতের পক্ষে দাঁড়িয়েছে তা বিশ্বে ভারতের প্রভাব বৃদ্ধিকেই তুলে ধরেছে।

এটা স্পষ্ট যদি ভারত দৃঢ়তার সঙ্গে চীনের বিরুদ্ধে না দাঁড়াতো তবে চীন এতদিন ডোকলাম পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করে ফেলত। সে ক্ষেত্রে চীন নাথুলা পাশের কাছে পৌঁছে যেত। এবং ট্রাই জংশন ধরে তারা চিকেন নেক অর্থাৎ শিলিগুড়ি করিডোরে নিজের সামরিক প্রভাব কয়েক গুণ বাড়িয়ে ফেলত। যার ফলে চীনের ভারতের সঙ্গে দর কষাকষি অনেক সহজ হয়ে যেত। উল্লেখ্য, শিলিগুড়ি করিডোর উত্তরপূর্ব ভারতের সঙ্গে অবশিষ্ট

ব্রিকস

ভারত, চীন, রাশিয়া, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে ব্রিকস সংগঠন গড়ে উঠেছে ২০০৯ সালে। প্রথম সম্মেলন আয়োজিত হয় ২০০৯ সালে রাশিয়ায়। বিশ্বের এক চতুর্থাংশ ভূমি, অর্ধেক জনসংখ্যা ও ২৫ ভাগ বিশ্বের জিডিপির অংশ নিয়ে ব্রিকস। সুরক্ষা পরিষদের দুই স্থায়ী সদস্য ও সুরক্ষা পরিষদের অন্য তিন সম্ভাব্য সদস্যদের নিয়ে এই সংগঠন। ব্রিকস দেশগুলি নিজস্ব ব্যাঙ্কও গড়ে তুলেছে। এবারের সম্মেলনে মিশর-সহ তিনটি দেশ আমন্ত্রিত ছিল।

ভারতের একমাত্র যোগাযোগের জায়গা। চীন ভেবে ছিল তারা ডোকলাম কব্জা করে নেবে সেক্ষেত্রে ভারত এবং ভুটানের আন্তর্জাতিক মঞ্চে চিৎকার করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।

ভারত শুরু থেকে ডোকলাম বিবাদকে কূটনীতিক ভাবে সমাধানের পক্ষে ছিল। কিন্তু চীনের তরফ থেকে তাদের সরকারি পত্রিকা গ্লোবাল টাইমসের মাধ্যমে বারবার ভারতকে যুদ্ধের হুমকি দেওয়া হয়। এমনকী চীনা প্রবক্তারা ভারতকে সরাসরি ডোকলাম ছাড়ার ১৪ দিনের আল্টিমেটামও দিয়ে ফেলে। কিন্তু ভারত কোনো প্ররোচনায় পা দেয়নি বা গরম গরম কথা বলে বাজার গরম করেনি। চীন যে ভাবে নিজেকে যুদ্ধবাজ দেশ হিসেবে তুলে ধরেছে এর বিপরীতে ভারত নিজেকে দায়িত্বশীল পরমাণু শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরে। বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ সংসদে দাঁড়িয়ে বলেন ভারত কূটনীতির মাধ্যমে সমাধান চায় কিন্তু যতক্ষণ চীনা বাহিনী ডোকলামে থাকবে ভারতীয় বাহিনীও নিজের অবস্থান বদলাবে না। পরিস্থিতি আন্দাজ করে চীন সারা বিশ্বে চীনা কূটনীতিবিদদের সরব হতে বলে। বিপুল অর্থও ভারত-সহ বিশ্বের বহু দেশের মিডিয়া হাউসগুলিতে ঢালা হয় বলে খবর। চীনা কূটনীতিবিদরা চীনের অবস্থান বোঝাতে বিশ্বের প্রায় সব দেশের কূটনীতিবিদদের সঙ্গে বৈঠকও করে। এমনকী ভারতের সবচেয়ে পুরোনো একটি রাজনৈতিক দলের যুবরাজের সঙ্গেও বৈঠক করে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ভারতে কিছুটা সফল হলেও সারা বিশ্বে মাঠে মারা যায়। কিছু ভারতীয় মিডিয়া হাউস চীনের স্বপক্ষে যুদ্ধভীতি তৈরি করলেও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর নো টেনশনের অবস্থান ভারতীয় জনগণের মনে কোনো ভয়ের জন্ম দেয়নি। ফলে চীনের যুদ্ধের জিগির তুলে ফায়দা লোটার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। উল্টে জাপানের মতো শক্তিশালী ও চীনা প্রতিবেশীদেশ সরাসরি ভারতের পক্ষে মুখ খোলে। শেষে ডোকলাম থেকে ভারত-চীন দুই পক্ষই সেনা সরিয়ে ডোকলামকে তার পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়।

ডোকলামে চীনের সমরনীতির ব্যর্থতার জন্যই হয়তো ডোকলাম পরবর্তীকালে চীনা সেনাপ্রধানকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে ডোকলামকে ভুটানের ভূখণ্ড বলেও চীন স্বীকার করে নেয়।

ডোকলামে চীনের সমরনীতির ব্যর্থতার জন্যই হয়তো ডোকলাম পরবর্তীকালে চীনা সেনাপ্রধানকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে ডোকলামকে ভুটানের ভূখণ্ড বলেও চীন স্বীকার করে নেয়। যদিও আগে তারা ডোকলামকে নিজেদের ভূখণ্ড বলে ঘোষণা করেছিল।

ডোকলাম ও ব্রিকসের সাফল্য ভারতের কূটনীতিক দর কষাকষির ক্ষমতা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে বলে সমর বিশেষজ্ঞদের মত। যে ভাবে চীনকে ভারত পিছু হটতে বাধ্য করেছে তাতে এটা স্পষ্ট দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় চীনা প্রতিবেশী দেশগুলি চীনা আগ্রাসন রুখতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াবেই। চীনা আগ্রাসন রুখতে পারে ভারত এই বার্তাও বিশ্বে ভারতের প্রভাব বাড়াবে। বর্তমানে চীন বিশ্ব কূটনীতির জগতে এতটাই কোণঠাসা যে তারা উত্তর কোরিয়ার জুজু দেখিয়ে নিজেকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চাইছে বলে বিশেষজ্ঞদের মত। এখানেই প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাফল্য। তার নিরবচ্ছিন্ন বিদেশযাত্রার ফল।

এই সময়

হ্যারিকেন-ইরমা

ভয়াবহ হ্যারিকেন-ইরমার আঘাত থেকে বাঁচাতে দক্ষিণ ফ্লোরিডার সাড়ে ছয় লক্ষ

বাসিন্দাকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাদ যায়নি পশুরাও। মিয়ামি চিড়িয়াখানার পশুদেরও রাখা হয়েছে অস্থায়ী আবাসে।

মার্জার পালন

লোকাল ট্রেনে উঠে আপনি দেখলেন চারপাশে ঘুরঘুর করছে একপাল বেড়াল।

তাদের গলায় খুশির ডাক। জাপানের ওগাকি স্টেশনে বেড়ালেরা অভ্যর্থনা জানাল যাত্রীদের। উদ্যোক্তা একটি পশুপ্রেমী সংস্থা। রাস্তার বেড়ালদের দেখে কেউ যাতে ভয় না পায় তাই এই উদ্যোগ।

হিটলারি

অবসর পেলে হিটলার মাঝে মাঝে শখের বক্সিং করতেন। সম্প্রতি আমেরিকার এক

নিলাম ঘরে তাঁর ব্যবহার করা বক্সিং শর্টসের দাম উঠল ৫০০০ ডলার। শর্টসের দৈর্ঘ্য ১৯ ইঞ্চি, কোমর ৩৯ ইঞ্চি। সঙ্গে হিটলারের মোনোগ্রাম, এ. এইচ।

সমাবেশ -সমাচার

শিলিগুড়িতে মাতৃসম্মেলন

''নিবেদিতাকে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে নিয়ে এসেছিলেন ভারতবর্ষের মেয়েদের জাগানোর জন্য। নিবেদিতার নাতনিকে এবছর সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচারের কার্যালয়ে। তিনি এতবছর বাদেও ভারতে নিবেদিতার জন্য প্রবল ভাবাবেগ দেখে বিস্মিত ও আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলেন। নিবেদিতা তাঁর প্রতিটি রক্তবিন্দু ভারতবর্ষের জন্য নিবেদন/উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতভাবনার মননে এক স্ফুলিঙ্গ যা স্বল্পায়ু হয়ে দার্জিলিংয়ে নির্বাপিত হয়েছিল।''

উপরোক্ত বক্তব্য দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সারদাপীঠের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা নির্ভীকপ্রাণার। তিনি গত ৩ সেপ্টেম্বর বিকেলে শিলিগুড়ির মার্গারেট স্কুলের দ্বিতলে

স্থিত সভাগৃহে ভিড়ে ঠাসা এক মাতৃসম্মেলনে বক্তব্য রাখছিলেন। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোগ বিবেকানন্দ কেন্দ্র এবং শিলিগুড়ি শাখার ভগিনী নিবেদিতা সার্ধজন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতির। প্রব্রাজিকা নির্ভীকপ্রাণা আরও বলেন, ''স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে নিবেদিতা (মিস্ মার্গারেট নোবেল)-র প্রথম সাক্ষাৎ ১৮৯৫-এর নভেম্বরে, লন্ডনের ৬৩ নং সেন্ট জর্জেস রোডের এক বাড়িতে, এক সান্ধ্য ঘরোয়া বৈঠকে। উচ্চশিক্ষিতা যাযককন্যা মার্গারেট নোবেলকে স্বীয় ধর্মের বাঁধাগৎ মোক্ষমুক্তির সন্ধান দিতে পারেনি। সে সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের বৈদান্তিক দর্শনের মোক্ষবিষয়ক ব্যাখ্যায়। স্বামীজী বলেছেন ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সম্বল। Every man is potentially divine, যা খ্রিস্টধর্মের গোঁড়ামিতে বলা হয়নি। স্বামীজীর কথা নিবেদিতার অন্তরে আলোড়ন তুলেছিল। পরবর্তীতে নিবেদিতা ভারতে আসতে চেয়েছেন। স্বামীজী কিছু পরে অনুমতি দিলেন, নিজে গিয়ে নিবেদিতাকে স্বাগত করলেন। বললেন, ''তোমার মধ্যে জগত আলোড়নকারী শক্তি নিহিত রয়েছে। ভারতের মেয়েরা, মায়েরা শৃঙ্খলিত, অবহেলিত, নিপীড়িত। তাদের জাগাতে হবে।''

১৮৯৫ থেকে ১৯০২ —পদ্মকোরকের মতো নিবেদিতার একটি একটি পাপড়ি উন্মোচিত হয়েছে। ১৬নং বোসপাড়া লেনের প্রায়ান্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরের ছোট্ট কুঠুরিতে

এই সময়

দর্পণ-সখা

ছোট্ট একটা কুকুর। পায়ের কাছে পড়ে একটুকরো হাড়। পাশেই একটা আয়না।

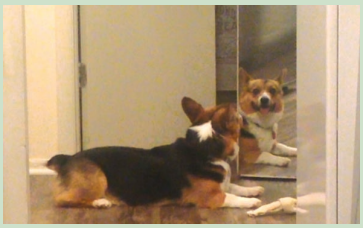

নিজের প্রতিবিম্বকে হাড়ের ভাগ দেওয়ার জন্য সে উদগ্রীব। সম্প্রতি এরিক স্মিথ এমনই এক ভিডিয়ো টুইটারে পোস্ট করেছেন। যা দেখে সারা বিশ্ব আপ্লুত।

সাবধান

ডমিনোজের পিৎজাপ্রেমীরা সাবধান। দিল্লি নিবাসী রাহুল অরোরা জানিয়েছেন, তিনি

অনলাইনে পিৎজার অর্ডার করেছিলেন। প্যাকেট খোলার পর দেখা গেল পিৎজায় পোকা থিকথিক করছে।

কোলে

অফিস টাইমে মেট্রোয় বসার সিট পাওয়া যাবেই এমন কোনও কথা নেই। কিন্তু সিট না পেলেও কেউ কেউ ঠিক আদায় করে নেন। চীনের এক বয়স্ক মহিলা এক যুবককে সিট ছেড়ে দিতে অনুরোধ করে ব্যর্থ হওয়ায় পর অন্য এক যাত্রীর কোলে বসে পড়েন।

সমাবেশ -সমাচার

বছরের পর বছর কাটিয়ে দিয়েছেন নিবেদিতা ক্ষুধায়, বিনা আলো-পাখাতে। ভারতের মেয়েদের সেবা করবেন বলে। ১৮৯৮-এর ১১ মার্চ স্টার থিয়েটারে স্বামীজী বললেন, 'ইংল্যান্ড আমাদের এক অপূর্ব উপহার দিয়েছে— তিনি মিস্ মার্গারেট নোবেল।' প্রব্রাজিকা নির্ভীকপ্রাণা আরও বলেন— ''আজকের এই বিরাট সংখ্যায় মা-বোনদের উপস্থিতি যদি স্বামীজী দেখতেন তাহলে দারুণ খুশি হতেন''। এদিন সভার শুরু হয় নিবেদিতার বিশাল (কাটআউট) প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সন্ন্যাসিনী প্রবাজিকা নির্ভীকপ্রাণা। মঞ্চে ছিলেন অধ্যাপিকা কৃষ্ণা দাস সেনগুপ্ত ও বিবেকানন্দ কেন্দ্রের হায়দরাবাদ থেকে আগত কার্যকর্ত্রী সুজাতা নায়েক। তিনি নারীশক্তি জাগরণ ও নিবেদিতা বিষয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন— ''ভারতে নারীশক্তির ভূমিকা চিরকালই রয়েছে। আলাদা করে জাগরণের কথা নেই। পাশ্চাত্যে যেখানে পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, শিশুরা জানে না তাঁর বাবা কে? সেখানে ভারতে মা-বাবাই শিশুকে প্রথম সংস্কার দেন'। পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা প্রণালীর অসারতা তিনি সবার সামনে তুলে ধরেন। সাবধান করেন, আধুনিকতার নামে আমরা যেন সেই জীবনকে গ্রহণ করার ভুল না করি। এদিনকার সভায় মায়েদের উপস্থিতি ছিল দেখার মতো। দু' হাজারের মতো। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন পায়েল চৌধুরী, সভা পরিচালনা করেন শ্রীমতী শম্পা মুখার্জী ও রঞ্জনা ভট্টাচার্য। প্রথম বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা কৃষ্ণা দাস সেনগুপ্ত। তিনিই ধন্যবাদ প্রদান করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা ১২৫তম বর্ষ উদযাপন

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন খণ্ডে যুবকদের অত্যন্ত যত্ন উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার ১২৫তম বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠিত হলো। কোলাঘাট খণ্ডের কোলাঘাট বাজারের বিবেকানন্দ মোড়ে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো

বক্তৃতার ১২৫ বর্ষ স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৬ সেপ্টম্বর বুধবার মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সামনে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার স্মরণে স্বামী বিশ্বময়ানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে একটি জাগরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং স্থানীয় যুবকগণ সাইকেল র‍্যালিতে অংশ নেয়। ৯ সেপ্টেম্বর শনিবার পাঁশকুড়ার হাউর রেল স্টেশনের উত্তর প্রান্তে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার স্মরণে একটি জাগরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পাঁশকুড়া ব্রাডলিবার্ট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বনমালী সামন্ত এবং মঠ বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী ইস্টানন্দ মহারাজ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ৭ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার চণ্ডীপুরের সপ্তর্ষি অতিথি নিবাসে সকাল ৯ টায় স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো

এই সময়

গল্ফপ্রেমী

গল্ফের প্রতি এমন ভালোবাসা সচরাচর দেখা যায় না। পিছনে জঙ্গলে আগুন লেগে গেছে।

দাউ দাউ আগুনে জ্বলছে গাছপালা। কিন্তু ওরা খেলায় মত্ত। ঘটনাটা আমেরিকার ওরেগনের বেকন রক গল্ফ কোর্সের।

ঘেউ ঘেউ

সরকারি কর্মচারীরা বকেয়া ডিএ চাইলে সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ঘেউ ঘেউ মিউ

মিউয়ের মতো শোনায়। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও তাঁর মন্তব্যকে দুর্ভাগ্যজনক বলেছেন। আরও বলেছেন, মমতার উচিত গ্যাজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে মন্তব্যটি সংশোধন করা।

শ্রমিক পরিচিতি

শ্রমিকরা যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সুযোগসুবিধা সহজে পেতে পারেন তার জন্য

শীঘ্রই কেন্দ্র ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নম্বর বিতরণ করবে। একথা জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মোদ্যোগ বিভাগের মন্ত্রী সন্তোষ গাঙোয়ার।

সমাবেশ -সমাচার

বক্তৃতার স্মরণে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর স্থানীয় যুবকরা সুসজ্জিত ট্যাবলো-সহ সাইকেল ও মোটর সাইকেল র‍্যালিতে অংশ নেয়। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার স্মরণে ৫ সেপ্টেম্বর নন্দীগ্রামে জানকীনাথের মন্দিরের সামনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং শতাধিক যুবক সাইকেল র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে। ৯ সেপ্টেম্বর বিকাল ৪ টায় হলদিয়ার কলকাতা পোর্টট্রাস্টের সভাগৃহে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় যুবকরা সুসজ্জিত ট্যাবলো-সহ মোটর সাইকেল র‍্যালিতে অংশ নেয়। ১০ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায়, চৈতন্যপুরের শহিদ পাঠাগারে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে স্থানীয় যুবকেরা সাইকেল র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে। ১০ সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল ১০ টায় মেচেদা জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন রথের মাঠে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়, পরে স্থানীয় যুবকেরা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা-সহ সাইকেল র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে।

রঘুনাথগঞ্জে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ নগরে সরস্বতী শিশুমন্দিরের উদ্যোগে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবিরের সমারোপ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় গত ৩ সেপ্টেম্বর রবিবার। বিকেল ৪টে ৩০ থেকে বিকেল ৬টা ৩০ পর্যন্ত এই শিবিরে ২ ঘণ্টা ধরে অভিনব পদ্ধতির দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় সম্ভাষণ শেখানো হয়। শিবিরে শিশুমন্দিরের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ইচ্ছুক ভাইবোন

এবং অভিভাবক/অভিভাবিকাগণ মিলে প্রায় ২৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। এই শিবিরে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। শিবিরের শিক্ষক ছিলেন সংস্কৃতভারতীর মুর্শিদাবাদ জেলা সংযোজক সুমন্ত প্রামাণিক, সহকারী ছিলেন অঞ্জনা ভকৎ ও শ্রাবণী দাস। গত ৩ সেপ্টেম্বর শিশু মন্দিরের প্রধানাচার্যা সোমা সেনগুপ্তা প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সমারোপ কার্যক্রমের সূচনা করেন এবং বর্তমানে সংস্কৃতের গুরুত্ব ও মহত্ব বিষয়ে বিশেষভাবে বর্ণনা করেন। এছাড়াও তিনি সমস্ত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন কমপক্ষে ২টো করে সংস্কৃতবাক্য শেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই দিন শিবিরের শিক্ষার্থী ভাইবোনেরা দশদিনে যতটা শিখেছে তা সংস্কৃত ভাষাতেই অভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শন করেছে। শিবিরে আগত ছোটছোট ভাইবোন এবং অভিভাবক/অভিভাবিকাদের এত কম সময়ে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে দেখে আশ্চর্য হয়েছেন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ। এই শিবিরের একটা বিশেষত্ব ছিল যে ওই শিবিরেরই চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী প্রেরণা দে সমগ্র সমারোপ কার্যক্রম সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষাতেই পরিচালনা করে। মুর্শিদাবাদ জেলার পঞ্চবটী গ্রামের জ্যোতির্ময় ভবনে সংস্কৃত ভারতীর উদ্যোগে অরঙ্গাবাদ ডিএনসি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি দশদিবসীয় সম্ভাষণ শিবির চালানো হয়। এই শিবিরে সংস্কৃত অনার্সের দশজন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। এই শিবিরেরও সমারোপ কার্যক্রম গত ৩ সেপ্টেম্বর রবিবার শিশুমন্দিরে একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি দাবি করে

অতিথি কলম

রতন সারদা

ভারতীয় সংবিধানের ৪৪তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভারতের আদালতগুলি বারবারই বিভিন্ন দলের সরকারকে দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার কথা বলে আসছে। ১৯৮৬, ১৯৯৫, ২০১৫-এর পর এখন তিন তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোকে বাতিল ঘোষণা করার ক্ষেত্রেও তারা এর আইনি ব্যাখ্যায় সেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের প্রসঙ্গই তুলেছেন। অবশ্যই তিন তালাকের বিষয়টি কোনো ধর্মীয় ব্যাপার নয় এটি নিতান্তই নারী- পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্ন।

অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে, ৫০-এর দশকে কংগ্রেস দলের বিপুল সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এই বিধিকে আইনে প্রচলন করলেন না কেন? সংসদ ও তার বাইরে সমর্থন থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি শুধু হিন্দু কোড বিলে সংস্কার এনেই থেমে গেলেন? এর সোজা উত্তর প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সাহসের অভাব। আর এই কারণেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে সংবিধানের ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালের অধীনে রেখে বলা হয়েছিল 'দেশ তার নাগরিকদের জন্য সারা দেশব্যাপী একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার ভবিষ্যত প্রয়াস করার উদ্যোগ নেবে।' এটি ছিল একটি মারাত্মক ভুল। সমগ্র দেশকে একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক সমাজে পরিণত করার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রবক্তারা বরাবর বলে আসছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের চক্রান্ত। তারা হয়তো নিজের সুবিধের কথা ভেবে অন্ধ হয়ে বসে আছে যেন জানে না যে তদানীন্তন Constituent Assembly-তে কোনো সঙ্ঘের সদস্য ছিল না। একই সঙ্গে যে আদালত 'শরিয়তি' আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে তিন তালাক বাতিল করে সঙ্গে সঙ্গে ইউসিসি চালুর প্রসঙ্গ টানল তারা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবক নয়। অন্যায়ভাবে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয়টিকে সঙ্ঘের বা হিন্দুত্বভাবের সঙ্গে জুড়ে দিতে চাই না।

মানুষের চিরাচরিত ধারণার বিপরীত অবস্থানেই ছিল সঙ্ঘ। তারা কখনই জোর করে ইউসিসি বা হিন্দু কোড বিল চালু করার পক্ষে ছিল না। শ্রীগুরুজী যিনি ৩৩ বছর ধরে সঙ্ঘের মূল চিন্তাধারাকে লালন পালন করে এসেছেন— ১৯৭২ সালে কে আর মালকানিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছিলেন— 'মুসলমানদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন পদ্ধতিতে যদি কোনো মানবিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের বিরোধিতা করা যুক্তিযুক্ত। সেক্ষেত্রে সঠিক সংস্কারী দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই জরুরি। কিন্তু কেবলমাত্র যান্ত্রিকভাবে সব কিছু এক থাকবে এমনটা ভাবা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে মুসলমানদের উচিত তাদের নিজেদের মধ্যে থেকেই সংস্কারে উদ্যোগী হওয়া।' তাহলে ইউসিসি দেশে চালু হোক এটা সঙ্ঘের অবশ্য কাম্য হলেও প্রয়োজনীয় সংস্কারের তাগিদ দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যে থেকেই উঠে আসুক এটিও তাদের সমভাবে কাম্য।

বহু মুসলমান পণ্ডিতদের কাছ থেকে এটা জানা গেছে যে 'শরিয়া' কখনই একটি ঈশ্বর-নির্দেশিত স্বর্গীয় বিধি নয়। কোরান ও হাদিসের ওপর ভিত্তি করে শরিয়ায় বিভিন্ন আচার পদ্ধতি, অনুশাসন সবেরই অন্তর্ভুক্তি শুরু হয় পয়গম্বর মহম্মদের মৃত্যুর ৩০

> "প্রচলিত আইনের ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মই সমাজকে ধরে রাখে। এর সঙ্গে ধর্মীয় উপাসনা পদ্ধতির কোনো সম্পর্ক নেই। এর সরল অর্থ সকলের জন্য ন্যায়। ধর্মের এই ভারতীয় সংজ্ঞার যথাযথ প্রয়োগই ন্যায়সঙ্গতভাবে দেশের সকল নাগরিককে এক সূত্রে গেঁথে রাখার পক্ষে উপযুক্ত।"

বছর পর খলিফার রাজত্বকালে। আর এই অন্তর্ভুক্তির পরিমার্জন-পরিবর্ধন চলতে থাকে ১০০ বছর ধরে। তাই এই সমস্ত অনুশাসনগুলির ৯০ শতাংশই আদৌ কোরানের অংশ নয়। আদতে এগুলি তদানীন্তন আরবি সমাজের অনুসৃত বিভিন্ন রীতিনীতি, আচার ও প্রথা মাত্র। তাই এগুলি বিশ্বের বহুধা বিভক্ত মুসলমান সমাজে আক্ষরিকভাবে প্রথা অনুযায়ী কখনই অনুষ্ঠিত হয় না। এই বিধিগুলির দেশ কাল ভেদে বহুলাংশে বিলুপ্তিও ঘটে গেছে। যে নির্ভীকতার সঙ্গে মুসলমান নারীরা আজ শরিয়তি আইনের আড়ালে নানান কুপ্রথা ও অন্যায় কাজকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন তাতে তাঁদের বিক্ষোভকে আর থামানো যাবে না।

আদালতের রায়ের পর মোল্লারা ও গোঁড়া তথাকথিত মুসলমান ধর্মগুরুরা আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে কোনো এক তফশিলি শ্রেণীর আচরিত সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে যে অভ্যাসগুলি মুসলমান সমাজে চালু হয়েছিল, পরিবর্তিত সময় সমাজ ও পরিস্থিতির সাপেক্ষে সেগুলির যে বিপুল পরিবর্তন দরকার সে প্রয়োজন মানতে নারাজ। এই ধর্মগুরুরা আদৌ মুসলমান সমাজের বিশেষ করে মহিলাদের প্রতিনিধিস্থানীয় নন। এরা অনেকটা স্বনিযুক্ত এবং সুবিধাবাদী। এই পরিপ্রেক্ষিতে আইনের মাধ্যমেই ইউসিসি লাগু করা ছাড়া পথ নেই। এরা মধ্যযুগীয় পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা ছাড়তে নারাজ।

গত ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে টিভি চ্যানেলের একটি বিতর্কসভায় আমার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দিল্লি Diocess (চার্চের অধীন সংস্থা)-এর ফাদার শঙ্কর। তিনি জানালেন 'ক্যাথলিকদের নিজস্ব আইন থাকলেও এটা পরিষ্কার যে যখন ওরা যে দেশে থাকবে তখন সে দেশেরই আইন মেনে চলবে।' তিনি আরও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন খ্রিস্টানদের ইউসিসি নিয়ে কোনো সমস্যা নেই।

এক্ষেত্রে হিন্দু কোড বিলকে কখনই ইউসিসি-এর সঙ্গে এক গোত্রে দেখা চলে না। এখানেও অনেক ত্রুটি আছে। আর যারা মনে করছেন ইউসিসি প্রচলন হলে হিন্দুদের 'হিন্দু অবিভক্ত পরিবার' সক্রান্ত সম্পত্তি আইন বাতিলের মাধ্যমে হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, হতে পারে। এটি অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রযোজ্য হতে পারে। তাতে কোনো আপত্তি নেই। এর ফলে পুরুষদের মতোই মেয়েদেরও সম্পত্তির ওপর সমানাধিকার বর্তাবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত আইন থাকার প্রয়োজন হবে না। এটি তো খুবই ভাল প্রস্তাব। ইউসিসি চালু হলে বিবাহ বিচ্ছেদ সহজ হয়ে যাবে শুধু নয়, মেয়েরাও পুরুষদের মতো বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর সমান অধিকার পাবে। ইউসিসি-এর প্রচলনে যদি যে কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েকে দত্তক নেওয়ার সুবিধে চালু করা যায় সেটি তো সামাজিক মঙ্গলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী পদক্ষেপই হবে।

আলোচনায় একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া যাচ্ছে সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা থেকেই উঠে আসছে ইউসিসি। পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী সরকার আর ধর্মচর্চা কেন্দ্র অর্থাৎ গির্জা সব সময় আলাদা থাকবে। ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে যা লালিত তা হলো সব ধর্মবিশ্বাসকে সম্মান করা। কিন্তু এর মানে কখনই এই নয় যে 'ধর্ম' বিষয়টিকেই বর্জন করে চলতে হবে। প্রচলিত আইনের ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মই সমাজকে ধরে রাখে। এর সঙ্গে ধর্মীয় উপাসনা পদ্ধতির কোনো সম্পর্ক নেই। এর সরল অর্থ সকলের জন্য ন্যায়। ধর্মের এই ভারতীয় সংজ্ঞার যথাযথ প্রয়োগই ন্যায়সঙ্গতভাবে দেশের সকল নাগরিককে এক সূত্রে গেঁথে রাখার পক্ষে উপযুক্ত। জাতি, বর্ণ, ধর্ম বা লিঙ্গ নিরপেক্ষভাবে আইন সকলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশে কোনো ধর্মীয় আইনই সংবিধানের ঊর্ধে উঠতে পারে না। যদি আমরা একই ফৌজদারি আইনকে দেশব্যাপী স্বীকার করে নিতে পারি তাহলে একই দেওয়ানি আইনকেও দেশব্যাপী বৈধ বলে মানতে হবে। এর সঙ্গে ধর্মের কোনো অজুহাত থাকতে পারে না।

আজকের দিনে দেওয়ানি আইন বিধি ও তার প্রয়োগের জটিলতা দেশের বিচারপ্রার্থী মানুষজনের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। অতি শীঘ্র এই দেওয়ানি আইনের কূট তত্ত্বকে মানুষের জন্য সহজ করে তোলবার দরকার আছে। ঠিক একই ভাবে দীর্ঘদিন আগে তাঁমাদি হয়ে যাওয়া বহু ফৌজদারি আইনেরও পরিবর্তন দরকার।

একজন শাহবানুকে যদি ন্যায় বিচার পেতে ৩০ বছর আইনের দরজায় দরজায় ঘুরতে হয় বা বিচারাধীন অবস্থায় কাউকে জেলে ২০ বছর পচতে হয় তাহলে সেই আইনের অর্থ কী? মোটা টাকা দিয়ে একজন উকিল না ধরলে যে আইনের যথাযথ ব্যাখ্যা একজন গরিব বিচারপ্রার্থী কোনোদিনই আদালতকে বোঝাতে পারবে না সেটা কি যুক্তিসঙ্গত। আর এই আইনের ফাঁক দিয়ে একটি মামলা যুগ যুগ ধরে প্রলম্বিত হতে থাকে। এতে বিপুল অর্থব্যয়ের সঙ্গে তা বিচারপ্রার্থীর মনোবলও চুরমার করে দেয়।

পূর্বাপর আলোচনা করে বলা যায়, আমাদের দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের সময় এসেছে। এখানে ধর্মীয় বাগাড়ম্বরের কোনো স্থান নেই। লক্ষ্য শুধু একটাই— বিশ্বজনীন সমদর্শিতার নীতিই অনুসৃত হবে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে। সেখানে বৈষম্যের কোনো স্থান নেই।

ভারতের জাতীয়তাবাদের অতন্দ্র রক্ষক স্বস্তিকা

পরাধীনতার যুগ থেকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়েই ভারতের জাতীয়তাবাদকে কিছু ব্যক্তি কোন পথে টেনে নিয়ে যেতে পারেন তা ডাঃ হেডগেওয়ার স্পষ্ট অনুমান করেছিলেন। তাঁর সেই অনুমান আরও স্পষ্ট হলো, যখন তাঁর শত অনুরোধ সত্ত্বেও ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ কমিটি, ১৯৩১-এর রাষ্ট্রীয় পতাকার রং নির্বাচনের সিদ্ধান্তকে (গেরুয়া রঙের পতাকার ধ্বজদণ্ডের পাশে চক্র) জাতীয়তাবাদীর মুখোশ ব্যবহার করা কিছু দেশীয় শত্রু শুধুমাত্র নিজেদের ইচ্ছার দ্বারা পদদলিত করলেন। সেদিন তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, রাণাপ্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী, ঝাঁসীর রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর হাতে উড্ডীয়মান ধ্বজের কথা, তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন চিতোর, হলদিঘাট, পানিপথের অসংখ্য বীরের জাতীয়তাবাদের কথা। স্বাধীনতার নামে প্রহসনের দিন থেকে, অখণ্ড ভারতকে জাতপাত ও ধর্মীয় ভিত্তিতে খণ্ডিত করার দিন থেকে, ভারতের চারিদিকের সীমান্ত সমস্যাকে জিইয়ে রেখে, দেশের শত্রুসম কিছু বিদেশির সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সেইসব মুখোশধারী জাতীয়তাবাদীরা আজও পরম্পরাগতভাবে এই ভারতেই অবস্থান করছেন। তাই সহজেই ১৩ ডিসেম্বর ২০০৯-এ ভারতের সংসদ আক্রমণের লজ্জার কাহিনি ঘটেছিল। বিদেশি আক্রমণের কলঙ্কিত চিহ্ন 'বাবরিধাঁচা' অপসারিত হওয়ায় কুমিরের কান্না শুরু হয়েছিল। ওই মুখোশধারী জাতীয়তাবাদীদের জন্যই আজও দেশে ঘটে চলেছে বেআইনি মুসলমান অনুপ্রবেশ, জেহাদি ইসলামিতন্ত্র, সেবা ও এনজিও-র মাধ্যমে মুসলমান ও খ্রিস্টান ধর্মান্তকরণ, সন্ত্রাস, বিচ্ছিন্নতা, বিদেশি মতবাদমূলক রাজনীতি, মেকলে-শিক্ষাপদ্ধতি, পাশ্চাত্য ভোগবাদী জীবনশৈলী, গো-সম্পদের নিষ্ঠুর হত্যা, দেবভাষা সংস্কৃতকে মৃত ভাষার আখ্যা, রাষ্ট্রের সমাজ ও সংস্কৃতির উপর প্রচণ্ড প্রহার। এরা সত্যিকারের জাতীয়তাবাদীদের ভয় পায়, মুসলমান বিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক বলে দেগে দিয়ে অপপ্রচার চালায়। চীন এবং পাকিস্তানের পদলেহন করে সন্ত্রাসবাদকে দেশের ভিতরে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালায়। দেশের এইসব শত্রুর জন্যই ইসলামী সংগঠনগুলি বহুবার তাদের ইস্তাহারে অথবা তাদের হুঁশিয়ারিতে দারুল হরব (অল্প সংখ্যক মুসলমান বসবাসকারী ভারত)-কে দারুল ইসলাম (সম্পূর্ণ মুসলমান বসবাসকারী ভারত) পরিণত করার জন্যই জেহাদ ঘোষণার সাহস পায়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতিতে মানুষ তার চাক্ষুস প্রমাণ পেয়েছে। আজও পাকিস্তান-ভারত-এর থর মরুভূমি সীমান্ত এলাকায় যেভাবে হিন্দুহত্যা এবং ধর্মান্তকরণ ঘটছে, সেই একই কায়দায় খারিজি মাদ্রাসায় অস্ত্র-ইস্তাহার মজুত রেখে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়া, বসিরহাটেও ওই একই কাজ মানুষ ঘটতে দেখেছে। বিগত দিনে কংগ্রেসের মহাসচিব রাহুল গান্ধীর মুখেও মানুষ 'লশকর-এ-তৈবা'-র প্রশংসা শুনেছে।

বিগত সাত-আট দশক থেকে 'স্বস্তিকা' অখণ্ডভারতের প্রাক্ ইতিহাসকাল থেকে আজ পর্যন্ত সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির আসল এবং স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে মানুষকে বিভ্রান্ত হবার হাত থেকে রক্ষা করে আসছে। ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এবং অন্যদিকে গ্রাম- শহর-নগরের প্রতিটি মানুষের জাতীয়তাবাদী সচেতনতা রক্ষার কাজ 'স্বস্তিকা' নির্ভয়ে এবং দৃঢ়ভাবে রাষ্ট্ররক্ষকের কর্তব্যে পালন করে চলেছে। নকল জাতীয়তাবাদীদের নৃত্যকলায় মানুষ আজ বিভ্রান্ত এবং বিস্মৃত। এমন অবস্থায় ভারতীয় আধ্যাত্মবাদই যে জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি এবং সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থেকেই

দেশের এবং বিদেশের ঘটে চলা ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে মানুষকে সচেতন করতে হবে, মানুষের ভয় দূর করতে হবে, জাতীয়তাবাদের অত্যাবশ্যক শিক্ষা দান করে দিশাহারা মানুষকে আসল ছবি দেখাতে হবে— তা একমাত্র 'স্বস্তিকা'-ই পালন করছে। ভারতীয়দের সুখসমৃদ্ধির প্রতীক যেমন স্বস্তিকা চিহ্ন, তেমনিই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ রক্ষায় এবং তার বিস্তারে, স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধির একমাত্র 'স্বস্তিকা'ই আজও অতন্দ্র রক্ষক। 'স্বস্তিকা'কে চিরন্তন করে রাখার দায়িত্ব মানুষের। কারণ মানুষ মনে করে জাতীয়তাবাদকে মানুষের হৃদয়ে গেঁথে রাখতে পারে একমাত্র 'স্বস্তিকা'।

—**অমিত ঘোষ দস্তিদার।**
সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

ভারতের নাথ সম্প্রদায়

'স্বস্তিকা'র ৩১ জুলাই ২০১৭ সংখ্যার 'চিঠিপত্র' বিভাগে প্রকাশিত 'ভারতের নাথ সম্প্রদায়' শীর্ষক পত্রের জন্য পত্রকার শ্রী বিরূপেশ দাস মহাশয়কে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। তাঁর তথ্যভিত্তিক লেখাটি ভারতের নাথ সম্প্রদায় যে বৌদ্ধদের মহাযান শাখা থেকে উদ্ভূত নয় তা আরও বেশি করে প্রমাণ করছে।

তবে পত্রকার তাঁর লেখার একস্থানে আমাকে প্রশ্ন করে বলেছেন, —"ধীরেন দেবনাথ মহাশয় কোন্ তথ্য অনুসারে বললেন— মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপালে শৈবধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির সমর্থক।"

পত্রকারের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমার উক্তিটি মোটেই কষ্ট কল্পিত নয়। তাই

আমার উক্তিটির সপক্ষে মহামহোপাধ্যায় ড. কল্যাণী মল্লিক বিরচিত 'নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। উক্ত গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় (শিরোনাম : মৎস্যেন্দ্র- গোরক্ষনাথের ঐতিহাসিককতা) লেখা হয়েছে,—

''ডাঃ মোহন সিংহের মতে সংগলদ্বীপ বা সকলদ্বীপ বর্তমান সিয়ালকোটের নিকট, সেই স্থান হইতেই মৎস্যেন্দ্র নেপালে গমন করেন। তিনি গোরক্ষের গুরু ও কানফাটা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, নেপালে তিনিই শৈবধর্ম প্রচার করেন।''

ওই গ্রন্থেরই ১৫৫ পৃষ্ঠায় হয়েছে,—

''শাস্ত্রী মহাশয় (হরপ্রসাদ)-এর মতে, নাথ ধর্ম প্রবল হইয়া উঠিলে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় জাতিই নাথদের পূজা করিত। মৎস্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মের নাম না থাকিলেও তিনি নেপালি বৌদ্ধদিগের প্রধান দেবতা, তাঁহার রথযাত্রা নেপালের একটি প্রধান উৎসব।''

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,--- ''মৎস্যেন্দ্রের কৌলগ্রন্থ হইতে তাঁহাকে বৌদ্ধ বলা যায় না, তিনি নাথদের গুরু হইয়াও নেপালি বৌদ্ধদের উপাস্যদেবতা হন।''

কাজেই একথা বলা অসঙ্গত নয় যে মৎস্যেন্দ্রনাথ বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির কিছুটা হলেও সমর্থক ছিলেন বলেই নোপালি বৌদ্ধদের তিনি উপাস্য দেবতা (অবলোকিতেশ্বর বা লোকেশ্বর)। কারণ উপাস্য দেবতা তিনিই হওয়ার যোগ্য যিনি তাঁর উপাসকদের ধর্মীয় রীতিনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আস্থা অর্জনে সক্ষম।

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

কোরবানি

মুসলমানরা কোরবানির দিনে প্রিয়জনকে আল্লার উদ্দেশ্যে কোরবানি করে। কিন্তু কোরবানি তো করে গোরুকে জবাই করে। গোরু কি মুসলমানের প্রিয়জন? কোরবানি যদি বিশ্বনিখিলের মিলনোৎসব, তবে কি নিরীহ প্রাণীকে হত্যা করে বিশ্বনিখিলের মিলনোৎসব হয়? বোঝা যায় না। এদিন ধনী নির্ধন নির্বিশেষে একই কাতারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে করুণাময়ের উদ্দেশে মাথা নত করে। সত্যি কি তাই? আরবের মুসলমানেরা কি ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের সঙ্গে একই কাতারে দাঁড়িয়ে নমাজ পড়ে?

এদিকে অন্তরের পঞ্চশক্তি বা পাশবিক শক্তিকে বলি দিতে হয়। তাহলে কেন ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর-গঞ্জ নিরীহ প্রাণীর রক্তে ভেসে যায়? আর খ্রিস্ট জন্মের আড়াই হাজার বছর পূর্ব থেকেই যদি মুসলমানেরা কোরবানির মাধ্যমে পাশবিক শক্তি বলি দিয়ে আসতে থাকে তাহলে কেন এত মুসলমান উগ্রপন্থীর রমরমা? এই উৎসবে নাকি আছে এক উচ্চ মানবিকতাবোধ! এই নিরীহ প্রাণীর আর্তনাদে, রক্তে সহিংসতায় কী উচ্চ মানসিকতাবোধ আছে— বোঝা গেল না।

—কিশোর বিশ্বাস,
হৃদয়পুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

সারে জাঁহাসে আচ্ছা/ হিন্দুস্তাঁ হমারা?

সারে জাঁহাসে আচ্ছা / হিন্দুস্তাঁ হমারা— দেশগান রচিত হয়েছিল অখণ্ডিত ভারতে কবি মহম্মদ ইকবাল দ্বারা। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি, দার্শনিক ও রাজনীতিক। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লিগের সভাপতি ও কবি মহম্মদ ইকবাল এলাহাবাদ অধিবেশনে প্রথম দেশ বিভাজনের কথা তুলেন। যা পরে জিন্নাহ্‌র হাত ধরে বাস্তবায়িত হয়।

এ অবস্থায় খণ্ডিত স্বাধীন ভারতে 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা' দেশগানটি গাওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? বলার তাৎপর্য হচ্ছে— কবি যদি হিন্দস্তাঁকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দেশ মনে করতেন তবে দেশ খণ্ডিত করার কথা তুললেন কীভাবে?

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

প্রসঙ্গ : ব্রহ্মাবর্ত

গত ১২ জুন ২০১৭ সংখ্যার স্বস্তিকায় 'ব্রহ্মাবর্ত' সভ্যতাকে দশ হাজার বছরের প্রাচীন আদি হিন্দু সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্গানাইজার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সন্দীপ চক্রবর্তী এই নিবন্ধে যারা হিন্দু সভ্যতাকে ৩০০০ বছরের পুরাতন বলে মনে করেন, তাদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশও করেছেন। কিন্তু ভারত-শ্রীলঙ্কার সীমান্তে সমুদ্রে যে রামসেতুটি পাওয়া গিয়েছে সেটি তো লক্ষাধিক বছরের পুরাতন। থিম্পসন ও ক্রিক রচিত ফরবিডন আর্কিওলজি গ্রন্থে কোটি কোটি বছর পূর্বের মানব সভ্যতার অস্তিত্বের অকাট্য বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ আছে। হিন্দু পুরাণগুলিতেও সনাতন ধর্মের কোটি কোটি বছরের ইতিহাস বিবৃত আছে। ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী-সহ আরও বহু গবেষক এই বিষয়ে প্রচুর তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। সেগুলিকে অগ্রাহ্য করে হিন্দু সভ্যতার বয়সকে মাত্র দশ হাজার বলাটাও কি অপরাধ নয়? আমরাই যদি লক্ষ কোটি বছরের হিন্দু ইতিহাসকে স্বীকার করতে সঙ্কোচ করি বা অস্বীকার করি— তাহলে হিন্দু বিরোধীরা আস্পর্ধা পেয়ে যাবেই। সন্দীপবাবুকে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের বয়ঃক্রম শ্রীমদভাগবত থেকে দেখে নিতে অনুরোধ জানাই ও ফরবিড্‌ন আর্কিওলজি ওয়েবসাইটি দেখবার আবেদন করি।

—রবীন সেনগুপ্ত,
বহরমপুর।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার অনুষ্ঠান মহালয়া

নন্দলাল ভট্টাচার্য

মহালয়া হিন্দু জীবনের এক পরম লগ্ন। ধর্মীয় এই অনুষ্ঠান স্মৃতি ও সত্তার অপূর্ব মেলবন্ধন। ঐতিহ্য তথা অস্তিত্বের গভীরে প্রোথিত এর শিকড়। প্রাপ্তি আর অগ্রগমনের আকাশে প্রসারিত এর ডালপালা। এই একটি অনুষ্ঠান শ্রদ্ধায়, স্মরণে, বিনম্র নিবেদনে পূর্ব ও উত্তরপুরুষদের মধ্যে মিলন ঘটায়। কে আমি? এসেছি কোথা থেকে? প্রথম দিনের সূর্যের এই জিজ্ঞাসার সজীব, সদাভাস্বর উত্তর এই মহালয়া।

মহালয়া স্মরণের অনুষ্ঠান। মহালয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অনুষ্ঠান। অতীতকে, ঐতিহ্যকে ধন্যবাদ নয়, আন্তরিক প্রণতি জানাবার অনুষ্ঠান। তাই বা কেন, এ হলো বিশ্বের সব কিছুর সঙ্গে— 'আব্রহ্ম স্তম্ভপর্যন্তম্'— সব কিছুকে আপন করে নেওয়ার এক সর্বাত্মক প্রয়াস। এ বিশ্বের সব কিছুই ঈশ্বরের দান। তার ওপর সকলের রয়েছে সমান অধিকার। সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয় কাউকে— এই বোধে আত্মস্থ হওয়াই মহালয়ার দীক্ষা। ভোগে নয়, সুখ ত্যাগে, সুখ যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু গ্রহণে। উপনিষদের এই শিক্ষারই অপরূপ প্রতিফলন মহালয়ার শ্রাদ্ধে-তর্পণে।

কেন মহালয়া, কী এর তাৎপর্য— তার গভীরে যাওয়ার আগে বরং শোনা যাক একটি পৌরাণিক কাহিনি। অঙ্গরাজ কর্ণ। অধিরথ সুতপুত্র তিনি। কুন্তীপুত্র হয়েও নিয়তির খেলাতে নিজের অজ্ঞাতেই কৌরবরাজ দুর্যোধনের পরম সুহৃদ তিনি। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের অন্যতম মহানায়কও কর্ণ। এসবই তাঁর এক-একটি পরিচয়। এর বাইরেও রয়েছে তাঁর আরও একটি পরিচয়। তিনি দাতা। তাঁর মতো দাতা খুব কমই দেখা গেছে ভূ-ভারতে। তাঁর কাছে কিছু চেয়ে বিমুখ হয়নি কখনও কেউ। সোনা-দানা, মণিমাণিক্য যে যা চেয়েছে তাই দিয়েছেন তিনি। এমনকী নিজের জীবনের সবচেয়ে বড়ো সুরক্ষা অভেদ্য কবচকুণ্ডলও তিনি হাসিমুখে দান করেছেন অবলীলায়।

বস্তুত মহাবীর কর্ণের চেয়ে দাতা কর্ণই বড়ো হয়ে ওঠেন সকলের কাছে। দানের জন্যই তিনি এক মহোত্তম মানুষ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হন কর্ণ। পরিণামে স্থান পান স্বর্গে। মরলোকে যে পরিমাণ সম্পদ তিনি দান করেছিলেন তার সহস্রগুণ ফিরে আসে তাঁর কাছে। স্বর্ণ সম্পদের বিপুল বৈভবের নিচে তিনি যেন চাপা পড়ে যান। তবুও দুঃখী তিনি। একটি অপ্রাপ্তির তীব্র জ্বালা তাঁকে অস্থির করে তোলে। সব পাচ্ছেন তিনি কিন্তু পাচ্ছেন না খাদ্য। পাচ্ছেন না পানীয়। আর সেই না পাওয়ার যন্ত্রণা বাড়িয়ে তোলে তাঁর কষ্টকে লক্ষ কোটি গুণ।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর কর্ণ যান যমরাজের কাছে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বলেন, এ কেমন বিচার! অফুরন্ত স্বর্ণরত্ন তিনি পাচ্ছেন, কিন্তু সেসব তো খাদ্য নয়। ক্ষুধার অন্ন নয়। তৃষ্ণার পানীয় নয়। তারই অভাবে যে তিনি বড়ো কাতর। এসব সোনাদানায় কাজ নেই তাঁর। এসব তো খাওয়া যায় না। সকলের আগে তো দরকার খাদ্যের। খাদ্য বা অন্নই তো জীবন। সেই খাদ্য কোথায়?

কর্ণের এই জিজ্ঞাসার মুখে যমরাজ কিছুটা অসহায়। বিব্রত কণ্ঠেই বলেন, এর আমি কী করব? মরলোকে মানুষ যা দান করে, পরলোকে এসে তাই কয়েক সহস্রগুণ ফিরে পায়। বলা যায়, ইহলোকে দানের মূল্যেই মানুষ কেনে পরলোকের সুখ। নরলোকে যে যা দান করে, পরলোকে পায় তাই-ই।

কর্ণ কুণ্ঠিত ভাবেই বলেন, আমি তো মর্ত্যে দানে কোনও ত্রুটি রাখিনি। বলা উচিত নয়, তবু বলছি, আমার তো দানবীর বলে একটা খ্যাতি ছিল। তাহলে কেন বঞ্চিত থাকব খাদ্য-পানীয় থেকে?

যমরাজ বলেন, সত্য তোমার কথা। সঙ্গত তোমার জিজ্ঞাসা।

—তাহলে?

—দেখ, আমি আগেই বলেছি, মানুষ যা যা দান করে পরলোকে তাই পায়। তুমি যে অজস্র সম্পদ দান করেছ তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাই এখানে এসেও পাচ্ছ তাই। কিন্তু তুমি কোনওদিন কাউকে অন্নদান করনি। দাওনি কোনও তৃষ্ণার্তকে জল। সে কারণে এখানে বঞ্চিত তুমি সেসব থেকে।

—কিন্তু আমি যে ক্ষুধায় অস্থির। এর একটা বিহিত করুন আপনি। ফিরিয়ে নিন সম্পদ, পরিবর্তে দিন একটু খাদ্য। একটু জল।

যমরাজ বলেন, আমি নিরুপায়। ঈশ্বরের বিধান বদলের কোনও ক্ষমতা আমার নেই।

—না জেনে অপরাধ করেছি। অন্নজল দান যে এত মহোত্তম দান, এটা জানা ছিল না। সেই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করুন।

একটা কিছু প্রতিবিধান করুন।

করুণা হয় যমরাজের। বলেন, বেশ একটা সুযোগ তোমাকে দিচ্ছি। ফিরে যাও তুমি মর্ত্যলোকে। একটি পক্ষকালের জন্য। যথেচ্ছ দান করো অন্নজল। নিশ্চিত করো তোমার এখনকার জীবনের প্রকৃত সুখ। যাও, তবে এক পক্ষকাল, মাত্র পনেরো দিনের জন্য।

পনেরো দিনের জন্য কর্ণ ফিরে আসেন মর্ত্যে। পনেরো দিন ধরে দান করেন অন্ন। তৃষ্ণার্তকে দেন জল। পরিণামে স্বর্গে ফিরে পান অন্ন। পান জল।

আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত পনেরো দিন কর্ণের ছিল দ্বিতীয় দফার মর্ত্যবাস। আর এই পনেরোটি দিনই হিন্দুশাস্ত্রে চিহ্নিত পিতৃপক্ষ হিসেবে। কর্ণ স্বর্গে ফিরে আসেন যে অমাবস্যা তিথিতে— সেটিই অভিহিত মহালয় বা মহালয়া নামে।

হিন্দু শাস্ত্রে, পিতৃপক্ষের পনেরো দিন প্রয়াত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তিলতর্পণ এবং শ্রাদ্ধ করার বিধি। ওই সময় দরিদ্রদের আহার দান করালে শুধু নিজের নয় পরলোকে পিতৃপুরুষদেরও অন্নজলের অভাব থাকে না।

গরুড় পুরাণে আছে, পুত্রছাড়া মুক্তি নেই। পিতৃপক্ষের পুত্রের দেওয়া অন্নজলেই তৃপ্ত হওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণেরও নির্দেশ, পিতৃপক্ষে পিতৃপুরুষকে অন্নজল দিতে হবে। পিতৃপক্ষের তর্পণ আর মহালয়ার শ্রাদ্ধই দেয় মানুষকে সুস্বাস্থ্য, জ্ঞান এবং সম্পদ। তাই মহালয়া তর্পণে রত হলো সকলে। শাস্ত্রের বচন, পিতৃপক্ষ বা মহালয়াপক্ষে পিতৃপুরুষরা নেমে আসেন মর্ত্যে— দর্শন করেন উত্তরপুরুষদের। তর্পণ শ্রাদ্ধে নিজেরা তৃপ্ত হন। আশীর্বাদ করেন উত্তরপুরুষদের। দীপান্বিতা অমাবস্যায় তাঁরা ফিরে যান পিতৃলোকে। তাই মহালয়ার যেমন তর্পণ-শ্রাদ্ধ, দীপান্বিতাতেও তাই। সঙ্গে আকাশ প্রদীপ জ্বালানো। তাঁদের পথ দেখানোর জন্য। নাকি এও কুয়াশা ঘেরা অন্ধকারে মানুষকে পথের দিশা দিতেই ধর্মীয় নির্দেশের আড়ালে এক সামাজিক দায় বহনের ব্যবস্থা।

মহালয়ার শুরু দেবীপক্ষের। এই পক্ষেই জগজ্জননী মা দুর্গার অকালবোধন করে রাবণকে নিহত করেন রাম। শারদীয়ার মাতৃবন্দনায় সকলে মাতেন এই দেবীপক্ষে।

মহালয়ার শ্রাদ্ধ ও তর্পণ— শুধু বঙ্গের নয় সমগ্র ভারতের অনুষ্ঠান। পিতৃপক্ষের পনেরোদিন না পারলেও অমাবস্যার মহালয়ে তর্পণ ও শ্রাদ্ধে শামিল হয় প্রায় সারা ভারত। এরই মধ্য দিয়ে একাত্ম হন সকলে। তাই মহালয়া একদিক থেকে মিলন, ঐক্য ও জাতীয় এমনকী বিশ্ব-সংহতিরও অনুষ্ঠান।

মহালয়ার পিতৃপক্ষের অন্যনাম ষোলা শ্রাদ্ধ। ১৬টি শ্রাদ্ধ বা দান করা হয় বলে এই নাম। উত্তর পূর্ব ভারতে যার নাম পিতৃপক্ষ, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে তারই নাম পিত্রুপক্ষ। এছাড়া কানাগত, জিতিয়া, মহালয়া পক্ষ, অপরপক্ষ, সর্বপ্রীতি অমাবস্যা, পিত্রু, পেদ্দেশা ও মহালয়া অমাবস্যা নামেও এটি পরিচিত।

হারিয়ে যাওয়া শহর

পাণ্ডুয়া

ডাঃ সঞ্জয় দেব

পাণ্ডুয়া— এই নামটি শুনলেই অনেকের চোখে ভেসে ওঠে মালদহ জেলার একটি স্থানের ছবি যা 'গৌড়-পাণ্ডুয়া' নামে বিখ্যাত এবং যা বাংলার মুসলমান শাসকদের রাজধানী হিসাবে ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গৌড়-পাণ্ডুয়ার খ্যাতির অপর কারণ, এই শহরটি প্রাচীন হিন্দু আমলের হলেও মুসলমান শাসকগণ, বিশেষত ইলিয়াস শাহী সুলতানরা, এর গুরুত্ব ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পাণ্ডুয়া শহরের ভাগ্যে এই মর্যাদা জোটেনি, তাই বেশিরভাগ লোক ও ইতিহাস-সংস্কৃতিপ্রেমীরা এর অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত নয়। এই দ্বিতীয় পাণ্ডুয়া বর্তমান হুগলী জেলার অনুন্নত আধা গ্রাম-আধা শহর। এর খুব কাছে ইতিহাসখ্যাত বন্দর আদিসপ্তগ্রাম, মরাঠা আক্রমণের স্মৃতিবিজড়িত ইটাচুনা রাজবাড়ি, ত্রিবেণী যা বাংলার সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। এবং শৃঙ্খলা দেবীর শক্তিপীঠ যা বর্তমানে বিস্মৃত। এই পাণ্ডুয়া যেতে গেলে কলকাতা থেকে সহজতম উপায় মেনলাইনের বর্ধমান বা পাণ্ডুয়া লোকাল।

মালদহের পাণ্ডুয়া এবং হুগলীর পাণ্ডুয়া— এই দুইয়ের মধ্যে মিলও বিস্তর। এই দুই শহর ছিল প্রাচীন বাংলার দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং দীর্ঘস্থায়ী সুনাম ও সম্পদ মধ্যযুগে এদের বিপদ ডেকে আনে। মালদহের পাণ্ডুয়ার মূল আকর্ষণ আদিনা মসজিদ, যা একটি হিন্দু মন্দিরের উপরের অংশ ভেঙে মসজিদে পরিণত করা হয়েছিল। হুগলী পাণ্ডুয়ার মূল আকর্ষণ একটি ১২৫ ফুট উঁচু মিনার ও তৎসংলগ্ন মসজিদ যা একটি বিষ্ণু মন্দিরের উপরের অংশ ভেঙে তৈরি হয়। বাংলার মুসলমান আক্রমণে এই দুই পাণ্ডুয়ার পতন হয় এবং এই দুই শহরের ইতিহাসে রক্তক্ষয়, লোকক্ষয়, সম্পদক্ষয় ও হাহাকার মিশে আছে। মালদহের গৌড় পাণ্ডুয়া যদি প্রাচীন বাংলার গৌড় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হয়, তবে হুগলীর পাণ্ডুয়া হলো একটি বিখ্যাত শক্তিপীঠ, যার দেবী শৃঙ্খলা। গৌড়ের সংস্কৃতি নিয়ে বাংলার শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট চর্চা হয়েছে, কিন্তু এই শক্তিপীঠের কাহিনি অনেকের অজানা। দ্বিতীয়ত, হুগলীর পাণ্ডুয়ার কাছেই আদিসপ্তগ্রাম বন্দর অবস্থিত ছিল। যা সরস্বতী নদীর শুকিয়ে যাওয়ার ফলে পরিত্যক্ত হয়। ১৭০০ সালের পর থেকে এই বন্দর আর ব্যবহৃত হয়নি। ইতিহাসের অনেক উত্থান পতনের সাক্ষী এই হুগলী জেলা। সপ্তগ্রাম বন্দর দিয়ে চাঁদ সওদাগর থেকে ইউরোপীয় বণিকরা সকলেই বাণিজ্য করে গেছে। ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীর মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলে এই বন্দরের উল্লেখ আছে। পর্তুগীজরা এই বন্দরের নাম দেয় 'Little Heaven', হুগলীর অপর নাম 'ক্ষুদ্র ইউরোপ' বা Little Europe। এর কারণ একসঙ্গে অনেক ইউরোপীয় দেশ (ফ্রান্স, পোর্তুগাল, নেদারল্যান্ড, ডেনমার্ক) যথাক্রমে চন্দননগর, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুরে তাদের কলোনি স্থাপন

করে। একটি জেলার মধ্যে এত বৈচিত্র্য বা ইউরোপীয় কলোনি ভারতের কোথাও নেই। এর থেকে হুগলী নদী ও তৎসংলগ্ন বন্দর শহরগুলির তৎকালীন গুরুত্ব কী ছিল তা অনুমান করা যায়।

আমাদের আলোচ্য পাণ্ডুয়ার গুরুত্ব মুসলমান আক্রমণের আগে কী ছিল তা জানতে গেলে ফিরে যেতে হবে ১৩০০ সালের আগে। বাংলার সেন সাম্রাজ্যের পতন হলেও পাণ্ডুয়া ছিল সুরক্ষিত। পাণ্ডুয়ার তৎকালীন রাজা যিনি পাণ্ডুরাজা নামে পরিচিত, গোহত্যার বিরোধী ছিলেন। পাণ্ডুয়ার কাছে 'মহানন্দে' ছিল তার প্রসাদ। দিল্লির সুলতান তখন ফিরোজ শাহ খলজি। একদিন সুলতানের ভাইপো তার ছেলের 'খতনা'র জন্য পাণ্ডুয়াতে কোনো কারণে অবস্থিতি করেন। তার ভাইপো শাহ সফিউদ্দিনের ছেলের 'খতনা' উপলক্ষে বহু লোক সমাগম হয় ও তাদের জন্য মদ্য-মাংসের ব্যবস্থা করা হয়। এই উপলক্ষে তার অনুচরেরা একটি গোরুকে হত্যা করলে তা পাণ্ডুরাজা মেনে নেননি। এর থেকে শুরু হয় বিরোধ। পাণ্ডুরাজা প্রতিশোধস্বরূপ সফিউদ্দিনের ছেলেকে মা কালির মূর্তির সামনে বলি দেন। এই ঘটনার কথা শাহ সফিউদ্দিনের মাধ্যমে দিল্লিতে পৌঁছালে সুলতান জাফর মানগাজীর নেতৃত্বে একটি বিরাট সৈন্যদল পাঠান পাণ্ডুরাজাকে দমন করার জন্য। দীর্ঘ যুদ্ধের পর পাণ্ডুয়াতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধে সফিউদ্দিনের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুস্থলে পরবর্তীকালে একটি মসজিদ তৈরি করা হয়। পাণ্ডুরাজা তার পরিবারসমেত ত্রিবেণীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। পাণ্ডুয়াতে হিন্দু শাসনের অবসান হয়। মুসলমান সৈন্যরা প্রতিশোধ স্বরূপ পাণ্ডুয়ার হিন্দু রাজ্যের চিহ্নগুলি ধূলোতে মিশিয়ে দেয়। জনশ্রুতি যে হিন্দুমন্দিরের ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দিয়ে পরবর্তীকালে ''বাইশ দরজা মসজিদ' তৈরি হয়।

এই কাহিনির মধ্যে কিছু অসঙ্গতি থাকলেও মোটামুটি ভাবে ধরে নেওয়া হয় যে যুদ্ধ ও রক্তপাতের মধ্যে দিয়েই পাণ্ডুয়াতে হিন্দু শাসনের অবসান হয়। মুসলমানরা যে হিন্দুদের অপমান করার জন্য গোহত্যা প্রচলন করেছিল তা সর্বজনবিদিত। শ্রীহট্ট বা সিলেট এবং বাংলার অন্যান্য স্থানে কিছু ক্ষুদ্র রাজার সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধের কারণ ছিল ওই গোহত্যা। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত মিনারটি পাঁচতলা উঁচু ও ১৬১টি ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়, যা বর্তমানে ASI (Archaeological Survey of India) দ্বারা সংরক্ষিত। মিনারের প্রবেশপথে হিন্দু মন্দিরের থেকে তুলে আনা দুটি পাথর-স্তম্ভ দেখা যায়। এই মিনারটি নাকি মুসলমানদের পাণ্ডুয়া-বিজয়ের স্তম্ভ হিসাবে ১৩৪০ সালে তৈরি হয় (একটি পুরোনো হিন্দু মিনারকে ভেঙে)। ১৪৪৬ সালের ভূমিকম্পে এটি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বর্তমানে এটি এখনকার অন্যতম আকর্ষণ, যা বাইরের পর্যটককে পাণ্ডুয়াতে টেনে আনে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অবধি পাণ্ডুয়াতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লেগে থাকত। এই দাঙ্গা দূর করার জন্য ১৯০৪ সালে মিনারের কাছে 'মাঘমেলা' শুরু হয়, যা এখনও লক্ষ লক্ষ লোককে আকৃষ্ট করে। এই মাঘ মাসের মেলার সঙ্গে প্রাচীন কোনো মেলার সম্পর্ক আছে কিনা তা আমার জানা নেই, তবে শক্তিপীঠ হিসাবে পাণ্ডুয়ার খ্যাতি প্রাচীনকাল থেকেই ছিল।

পাণ্ডুরাজার পতনের পর কিছুদিন মুসলমান শাসন চলে, তারপর পাণ্ডুয়া চলে যায় ব্রাহ্মণ ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজাদের দখলে। এই ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজা ও রানিরা তাদের শাসন প্রায় ৩০০ বছর চালিয়ে যায়। প্রবাদপ্রতিম রানি ভবশঙ্করী এই রাজবংশের শাসক। এদের রাজ্য ছিল হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের কিছু অংশ নিয়ে। ভুরিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ রাজাদের যুগ শেষ হয় হয় বর্ধমান রাজবংশের উত্থানে। সবার শেষে যে হিন্দু বিপ্লব পাণ্ডুয়াকে নাড়া দেয় তাহলো মরাঠাদের উত্থান। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু থেকে ব্রিটিশদের ভারতজয়ের আগে অবধি মরাঠা ব্রাহ্মণ (চিৎপাবন) পেশোয়ারা এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ১৮০০ সালের পর ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধে। ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে মরাঠা বর্গীরা 'চৌথ' কর, (যা ছিল এক চতুর্থাংশ কর) আদায় করার জন্য বাংলা, বিহার, ওড়িশার মুসলমান নবাব আলিবর্দি খানকে আক্রমণ করে। মরাঠাদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি ছিল বর্ধমানের কাটোয়াতে। এই সৈন্যদের মধ্যে অনেকে হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুরে পরবর্তীকালে স্থায়ীভাবে থেকে যায় ও বাঙালি সংস্কৃতিতে মিশে যায়। এই রকম একজন মরাঠা সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন কুন্দন (পরবর্তীকালে কুণ্ডু) যিনি ইটাচুনা রাজবাড়ির পূর্বপুরুষ। এই রাজবাড়ি পাণ্ডুয়ার খুব কাছেই। খন্যান নামক স্টেশন থেকে যেতে হয়। জায়গাটির নাম 'বর্গীডাঙ্গা' যা বাংলায় বর্গী আক্রমণকে স্মরণ করায়। বর্গী আক্রমণের সময় 'আদিসপ্তগ্রাম' বন্দরের গুরুত্ব প্রায় ছিল না। তার আগে থেকেই সরস্বতী নদীর শুষ্কতার কারণে পরিত্যক্ত হতে শুরু করে। এর সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুয়ার গুরুত্বও কমতে শুরু করে। হুগলী থেকে মানুষ যেতে থাকে সুতানটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রামের দিকে, যা পরবর্তীকালে কলকাতার জন্ম দেবে। সপ্তগ্রাম বা আদিসপ্তগ্রামের পতন কীভাবে কলকাতার জন্ম দিতে সাহায্য করেছিল তা নিয়ে প্রচুর বই লেখা হয়েছে। তা নিয়ে বিস্তর তর্কও হয়েছে। সেই তর্ক বা আলোচনায় না গিয়ে চলে আসি এই লেখার শেষ পর্বে। মালদহের পাণ্ডুয়া থেকে যদি হুগলী পাণ্ডুয়াকে কোনো বিষয় সবচেয়ে বেশি আলাদা করতে পারে তবে তা হলো শৃঙ্খল দেবীর শক্তিপীঠ।

আদি শঙ্করাচার্য বর্ণিত ১৮টি মহাশক্তি পীঠের একটি পাণ্ডুয়া, যেখানে সতীর পাকস্থলী পড়েছিল। এর দেবী শৃঙ্খলা। বর্তমানে এই দেবীর মন্দির বা পূজাস্থলের কোনো চিহ্ন পাণ্ডুয়াতে নেই। প্রাচীনকালে ছিল কিনা তাও সঠিক বলা যায় না। তবে পাণ্ডুয়ার মহানদে কালীপূজা ও বাঁশবেড়িয়াতে হংসেশ্বরী দেবীর পূজা বহুদিন থেকে হয়ে আসছে। বর্তমান হংসেশ্বরীর মন্দিরটি এবং তৎসংলগ্ন কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা নৃসিংহদেব রায় (১৭৮৮)। হংসেশ্বরী মন্দিরটি সম্পূর্ণ করেন নৃসিংহদেবের বিধবা পত্নী রানি শংকরী (১৮১৪ সাল)। হংসেশ্বরী মন্দিরের স্থাপত্য সাধারণ মন্দিরের থেকে আলাদা। মন্দিরটিতে ১৩টি মিনার (রত্ন) আছে যা প্রস্ফুটিত পদ্মকুড়ির মতো দেখতে। মন্দিরের ভিতরের অংশ তান্ত্রিক নিয়ম মেনে তৈরি যা মানুষের শরীরের সঙ্গে মিলে যায়। রাজা নৃসিংহদেব নিজে একজন তান্ত্রিক ছিলেন এবং তাঁর জীবনের শেষ সাত বছর (১৭৯২-১৭৯৯) তিনি বারাণসীতে তন্ত্রসাধনায় মগ্ন ছিলেন। দেবীর মূর্তিটি নীল রংয়ের, যা একটি নিমকাঠ থেকে তৈরি। প্রায় ২১ মিটার লম্বা এই মন্দিরের সঙ্গে রাশিয়ার মস্কোর St. Basil's Cathedral-এর সাদৃশ্য আছে।

রানি রাসমণি

এক অনন্যা নারীর নাম

রূপশ্রী দত্ত

রানি রাসমণি ১৭৯৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এক মাহিষ্য পরিবারে। রাসমণি অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। এগারো বছর বয়সে, জানবাজারের জমিদারবংশীয়— বাবু রাজচন্দ্র দাশের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই স্বামী মারা যান। জমিদারি দেখাশোনা অন্তঃপুরে দেবতার পূজার্চনা— সবই তিনি করতেন। বাল্যকাল থেকেই স্বভাবগত ভাবে তিনি ধার্মিক ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর আরও বেশি করে ধর্মকর্মে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

তিনি তেজস্বিনী নারী ছিলেন। ব্রিটিশরা সেইসময়, মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের ওপর কর আরোপ করেছিল। পরিণামে দরিদ্র মানুষগুলির উপার্জন আরও হ্রাস পাচ্ছিল। রাসমণি নির্ভীকভাবে তাঁর সক্রিয় প্রতিবাদ করেছিলেন। ব্রিটিশরা তখন এই অনাবশ্যক রাজস্ব তুলে নিতে বাধ্য হয়। একবার ব্রিটিশরা শান্তিভঙ্গের অজুহাতে দুর্গাপূজার শোভাযাত্রা বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়। সেখানেও রাসমণির দৃঢ়তা ও যুক্তিনিষ্ঠ প্রতিবাদে তারা নিবৃত্ত হয়।

তিনি তথাকথিত উচ্চবংশীয় না হয়েও ভক্তিরসের আবেগে গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গদাধর চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে এখানকার পুরোহিত নিযুক্ত হন। গদাধরের শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে পূর্ণ বিকাশ ঘটে এই দক্ষিণেশ্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভবতারিণীকে কেন্দ্র করেই। রাসমণি শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষাদীক্ষা অর্জন করেছিলেন।

রাসমণি বিভিন্ন ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজ করেছিলেন। জনগণের সম্বোধিত 'রানি' শব্দটি, রাসমণির ভাবমূর্তিতে এক যথার্থ তাৎপর্য আরোপ করেছিল। তাঁর দানধ্যানও ছিল প্রচুর। সুবর্ণরেখা নদীর পাশ দিয়ে পুরী পর্যন্ত দীর্ঘ পথ তাঁরই উদ্যোগে নির্মিত হয়। এতে তীর্থযাত্রীদের খুবই সুবিধা হয়েছিল। তিনি তাঁর স্বামী, বাবু রাজচন্দ্র দাশের নামানুসারে 'বাবুঘাট' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা দিবসে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উপবাস করে, শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র উপস্থিতিতে, তিনি বাবুঘাটের নির্মাণকার্য করান। আরও কিছু ঘাটও স্নানার্থীদের সুবিধার জন্য সংস্কার করান।

দক্ষিণেশ্বরে ঐতিহ্যগত দুর্গাপূজা, রাসমণি প্রচলন করেন। সারা রাত্রিব্যাপী যাত্রানুষ্ঠান সেখানে হোত। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর জামাতা মথুরামোহন যিনি মথুরবাবু নামেই পরিচিত ছিলেন— তিনিই সেই ধারা অব্যাহত রাখেন।

তদানীন্তন হিন্দু কলেজ ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতেও তিনি প্রচুর অর্থদান করেছিলেন প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নয়ন কল্পে। ১৮৬১ সালে এই মহীয়সী ইহলীলা সংবরণ করেন। ১৯৫৫ সালে 'রানি রাসমণি' ছবিতে বিখ্যাত অভিনেত্রী মলিনা দেবী নামভূমিকায় রানি রাসমণিকে জীবন্ত করে তোলেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিমপীঠে রাসমণির মূর্তি স্থাপিত আছে। এস্‌প্ল্যানেডে আছে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ— সেখানেও তাঁর মূর্তি আছে। জানবাজার এবং দক্ষিণেশ্বরে তাঁর নামানুসারে 'রানি রাসমণি' রোডও স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৯৩ সালে, তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষে, ভারত সরকারের ডাকবিভাগ থেকে, তাঁর নামে ডাকটিকিট মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই ভক্তিমতী, তেজস্বিনী, বহুমুখী সদর্থক কর্মকাণ্ডের সহায়িকা নারীকে জানাই আন্তরিক সশ্রদ্ধ প্রণাম।

তালাক নিয়ে একী হালাক

খুকুর খুকুর কাশে মিঞা, খুকু খুকুর কাশে, তালাকের কথায় মিঞা ফুকুর ফুকুর হাসে। সেই তালাকের কথায় বোধহয় এবার মিঞা- ভাইয়ের হাসির দিন ফুরালো। কেননা তালাকপ্রাপ্ত মহিলারা আর মুখ বুজে তালাক মেনে ধর্মরক্ষা করতে রাজি নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় একটা কথা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, না জাগিলে ভারতললনা এ ভারত বুঝি জাগে না জাগে না। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, অনেকদিন বাদে হলেও সর্বংসহা মুসলমান মেয়েরা আজ আর বোরখার অন্ধকারে নীরবে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে রাজি নয়; অন্ধকূপ থেকে মুক্তির জন্য মুখর।

আসলে কেঁচো যখন সাপের মতো ফণা ধরতে বাধ্য হয়, সে যে কী বেদনার তা এই নীরবে সহ্য করা অন্যায় তালাকপ্রাপ্ত মেয়েদের রুখে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা দেখেই আন্দাজ করা যায়। যুগ যুগ সঞ্চিত সমাজ নিগড়ের অন্ধকূপ থেকে মুক্তির জন্য ভারতে ললনার প্রয়োজন ছিল যে সর্বাগ্রে, সেকথা মুসলমান পঞ্চকন্যা প্রমাণ করেছেন। সায়রা বানো, গুলশন পরভিন, আতিয়া সাবরি, ইশরাত জাহান এবং আরফিল রহমান, এই পাঁচজন সাহসিকা ধর্মের নামে শত শত বৎসরের অন্যায় এবং লক্ষ লক্ষ অসহায় নির্যাতিতার হয়ে যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, তা আজ সার্থকতার দ্বারপ্রান্তে। ভারতীয় মুসলমান সমাজের অন্ধ কারা থেকে জীবন বাজি রেখে তাঁদের দৃঢ়কল্প সংগ্রাম এখন মুক্তির দিশারি।

একথা অনস্বীকার্য, যাঁদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম তাঁরা যদি নিজেরা এগিয়ে না আসেন তাহলে কোনও উদ্যোগই সফল হতে পারে না। স্বনির্ভরতাই শক্তির আবাহক। রক্ষণশীলতার বেড়াজালে নির্মমভাবে জড়িত শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য শিক্ষিত হিন্দু মহিলারা একদিন এগিয়ে এসেছিলেন বলেই, আজ আর পাণ্ডা-পুরুত বা পঞ্জিকা তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। যে-কোনও আন্দোলনের পুরোভাগে মহিলারা না থাকলে সে আন্দোলন সফল হওয়া দুরূহ। সম্প্রতি ঢাকায় যে মোল্লাবিরোধী বসন্তবিপ্লব হয়ে গেল, তার পুরোভাগে ছিলেন মহিলারা, বিশেষ করে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, বিশ্ববীক্ষায় দীক্ষিত ছাত্রী ও তরুণীর দল।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, তিন তালাকের মতো একটা মধ্যযুগীয় বর্বর অমানবিক নিয়ম, মাইনরিটি রাইটসের লেজ ধরে আমাদের দেশে অবাধে চলে আসছে বিগত সত্তর বছর ধরে। যেখানে প্রতিবেশী মুসলমান প্রধান দেশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ শুধু নয়, ইন্দোনেশিয়া, কিউনিশিয়া, টার্কি, আফগানিস্তান প্রভৃতিতেও এটির আমূল সংশোধন হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার প্রাক্কালে সেই গণপরিষদ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী কংগ্রেস রাজত্বের পঞ্চাশ বছরে সেই এক যুক্তিহীন অজুহাত দিয়ে ইসলাম ধর্মের নাম করে এই সামাজিক অন্যায় ও অসাম্যকে তোল্লা দিয়ে অযথা মোল্লাতোষণ করা হয়েছে।

শাহ বানো থেকে সায়রা বানো— দীর্ঘ তিরিশ বছর অতিক্রান্ত। তবে পার্থক্য এই যে, সুপ্রিম কোর্টের মানবিক রায়কে নস্যাৎ করার জন্যে রাজীব গান্ধীর সেকুলার আহাম্মকির চূড়ান্ত নিদর্শন সংবিধান সংশোধন করার মতো অবিমৃষ্যকারী কোনও সুযোগ এখন আর নেই। শাহ বানো মামলায় যদিও বিচারক কৃষ্ণ আইয়ার তাঁর রায়ে স্পষ্ট বলেছিলেন, No Law is above human Law. কিন্তু নির্বোধ সেকুলারিজম এমনই মোল্লাতোষণে অনড় যে, সে নাহি শোনে মানবিক ধর্মের কাহিনি। এবং কংগ্রেসি ভক্তকেষ্টরা আজও মাইনরিটি স্বার্থরক্ষার নাম করে ঢোল বাজাতে ব্যস্ত, মহান মোল্লাতন্ত্র জিন্দাবাদ, মানবিক অধিকার মুরদাবাদ।

তাই সর্বোচ্চ আদালতের মানবিক রায়কে নাকচ করতে সেকুলার প্রধানমন্ত্রী রাজীব উদ্যোগ নেন সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে সংবিধান সংশোধন করতে। মহান গণতান্ত্রিক স্বস্বীকৃত হিন্দু বাই মিসটেক অধার্মিক সেকুলার নেহরু সাহেবের একচক্ষু সমদর্শী বিচারে হিন্দু কোড বিলের ধাষ্টামোতে যার শুরু, স্বামী পরিত্যক্তার জীবনধারণের আর্জিকে নাকচ করতে সংবিধান সংশোধনে তার পরিণতি। আর শুরু থেকে শেষ অবধি তার দোসর হয়, পাকিস্তানের প্রবক্তা ভারতদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বামপন্থীর দল। একত্ববাদের ধ্বজাধারী পাকিস্তান সৃষ্টির পর এই বামপন্থী বুজরুকের দল বহুত্ববাদী ভারত গঠনের নামে, এখনও মোল্লাতন্ত্রের হয়ে যুক্তির জাল সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, তিন তালাকের মতো একটি কোরান-অসমর্থিত, রাজাদেশে প্রবর্তিত অমানবিক নিয়ম ভারতে বিগত সত্তর বছর ধরে এই কংগ্রেসি ও বামপন্থী বুজরুকদের মদতে

তিন তালাকের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর মুসলিম মহিলাদের মুখমিষ্টি।

অবাধে বহাল থেকেছে। এমনকী সেই বুজরুকির ধারা বহন করেই একজন কংগ্রেস (গান্ধী) প্রাইভেট লিমিটেডের ভজহরি সিব্বালজি Personal Law-এর ব্রিফ ধরে অন্যায়ের হয়ে ওকালতি চালিয়ে যান। আসলে এই মুসলিম পার্সোনাল ল'-টি ব্রিটিশ সরকারের তৈরি এবং তারই ফলে একটা সম্পূর্ণ বে-আইনি সংস্থা, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মাতব্বরির সুযোগ হয়। পার্সোনাল ল বোর্ডকে যদি মান্যতা দিতে হয় তাহলে খাপ পঞ্চায়েতের অনর কিলিংকেও আইনি মান্যতা দিতে হয়।

আসলে গণপরিষদেও, মুসলমান মেম্বারদের একটি অত্যন্ত অসার যুক্তি ছিল, যদি ব্রিটিশরাজ ১৭৫ বছর ধরে মরুদেশের এইসব মান্ধাতার আমলের আইনকে বলবত রেখে থাকে, তাহলে স্বাধীন ভারতে তার পরিবর্তনের প্রয়োজন কী। তাহলে তো ব্রিটিশ মনার্ককেই ভারতের রানিরূপে না মানার কোনও অর্থ থাকে না। আসলে ব্রিটিশরা এখানে যতই White man's burden বলে গলা ফাটাক না কেন, তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, নির্বিঘ্ন শাসনে তাদের অর্থনৈতিক শোষণকে অব্যাহত রাখা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনকানুন যেটুকু যেখানে করেছে, সেটা অল্পসংখ্যক ব্রিটিশ দিয়ে বিপুল জনসংখ্যার ভারতকে তাঁবে রেখে স্ব-উদ্দেশ্য সাধন করা। রাইফেলে চর্বির ব্যবহারের ধর্মীয় প্রতিবাদে, ভারতজুড়ে সিপাহি বিদ্রোহের ঘটনায় তাদের শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল।

তাই কোনও জনগোষ্ঠীরই ধর্মীয় ব্যবস্থায় হাত না দিয়ে সেটিকে বজায় রেখে কার্যোদ্ধার করাই ছিল তাদের বাস্তবপন্থা। তাই তারা হিন্দু, মুসলমান, পার্সি, ক্রিশ্চান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতির নিজস্ব আইনকানুনে হাত দেওয়ার চেষ্টা করেনি। সেই জন্যেই Muslim Personal Law (Shariat) Act 1937-এর সুযোগ নিয়ে All India Muslim Personal Law Board-এর মাতব্বরি শুরু হয়। কিন্তু ব্রিটিশরাজের নিয়ম Colonial আমল শেষ হলে শেষ হওয়ার কথা, কিন্তু নেহরুবাদী কংগ্রেসিরা তাকে বজায় রেখে নিজেদের ভোট বিপ্লবের সহায়ক করে মুসলমান মেয়েদের জীবন অভিশপ্ত করে তোলে।

তিন তালাক যে মুসলমান ধর্মের উৎস গ্রন্থ কোরান-সমর্থিত নয় তা জাস্টিস জোসেফ তাঁর রায়ে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। আসলে এই আইনের কোনও আইনি ভিত্তি নেই; এটা তৎকালীন খলিফা আবু বকর দ্বারা এক আদেশের দ্বারা প্রচলিত। তবে এই নিয়মে, খলিফা উমরের নিয়ম অনুযায়ী নাকি তালাক প্রার্থীকে তালাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা ছিল। উদভ্রান্ত সেই মধ্যযুগে মরুদেশীয় বর্বরদের একটি সমাজবদ্ধ ব্যবস্থায় আনার জন্যে আইন বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল।

যেমন ইসলামে সুদের কারবার বর্জনীয়, কিন্তু সমস্ত ইসলামিক দেশই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অধীনে। ইসলামে গান, বাজনা, নাচ, ছবি আঁকা নাকি নিষিদ্ধ, কিন্তু তার জন্যে বড়ে গোলাম, বিসমিল্লা, বেনারসি বাই বা এম এফ হোসেনের বিরুদ্ধে কোনও ফতোয়া নেই। আর মদ্যপান নিয়ে সেই কোন যুগে ওপর খৈয়াম লিখে গেছেন— "কালকে রাতে ফিরছি যখন ভাঁটিখানার পাঁড় মাতাল, পীর সাহেবকে দেখতে পেলাম, হাতে বোতলভরা মাল।" আসলে ভালো মুসলমান হওয়ার জন্য যে শুদ্ধাচার কোরানে নির্দেশিত, মুসলমান চোর, জোচ্চোর, খুনী, ধর্ষক, মাতাল, দাঙ্গাবাজ তা লঙ্ঘন করে অনায়াসে ছাড়া পেতে পারে।

খালি তালাক, হালালা নিকাহ, চার বিবি, এইটির ওপর কোনও মানবিক পরিবর্তন করতে গেলেই বিপদ। মোল্লাতন্ত্রের ধর্মে আঘাত অসহনীয় হয়ে ওঠে এবং তার হয়ে আইনি যুক্তিজাল বিস্তারেরও অভাব নেই। যেমন তিন তালাক মামলার বিচারে, এমনকী প্রধান বিচারপতি জাস্টিস খেহরও গণপরিষদের মুসলমান মাতব্বরদের অবান্তর যুক্তিরই প্রতিধ্বনি করেছেন।

জাস্টিস খেহর বলেছেন, ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাসের বিষয়, তার কাছে যুক্তির পরিধি সীমাবদ্ধ, আদালতের উচিত হবে না, যুগ যুগ আচরিত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যা কোনও ধর্মবিশেষের অন্তর্গত, যদিও তা আজকের দিনে অচল বলে মনে হয়। এখানেই মনে হয় জাস্টিস খেহরের বুদ্ধির বিভ্রান্তি। তিনি ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে সামাজিক আচারকে একাধারে রেখে বিভ্রান্ত হয়েছেন। আসলে ধর্মের উদ্দেশ্যলাভের সঙ্গে ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক আচার ভিন্ন কিন্তু তা ধর্মপালনের অঙ্গ নয়। সমস্ত ধর্মেই ধর্মের উদ্দেশ্য লাভের পন্থা ও জীবনযাপনের বিধি সেই ধর্মের অঙ্গ নয়। যেমন মুসলমান ধর্মের যে প্রধান তিনটি ফরজ আছে, তার সঙ্গে তালাক প্রথা বা নিকাহ হালালার কোনও সম্পর্ক নেই। যেমন সেই ওমর খৈয়ামের আমল থেকে সুরা ও সাকিসঙ্গ করা পিরসাবেরা মুসলমান ধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি।

যেমন হিন্দুধর্মে একদিকে আছে ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য সাধনে বেদ উপনিষদ, গীতা ভাগবতের অপরিহার্যতার কথা কিন্তু তার সঙ্গে ব্যাসামসাহেব কথিত পৃথিবীতে প্রথম আইনপ্রণয়নকারী মনুর সংহিতার অনেক তফাত। মনু কোডিফাই করেছেন, সে যুগের হিন্দুসমাজ, রাজা থেকে প্রজা কীভাবে জীবনযাপন করবে। সেই আইন সেদিনের বর্ণাশ্রম সমাজের পক্ষে ঠিক ছিল কিন্তু আজকের পরিবর্তিত পৃথিবীতে হিন্দু জীবনচর্যা তা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে এবং তাতে হিন্দুধর্মের কোনও হানি হয়নি। হিন্দু সমাজবিধির বিকৃতিতে একদিন যখন সমাজ আবিল হয়ে উঠেছিল, তখন হিন্দুধর্মের নেতারা সেই আবিলতার সংস্কারে উদ্যোগী হয়ে সমাজের মুক্তি ঘটিয়েছিলেন। যেমন রাজা রামমোহনের আন্দোলনের ফলে সরকারি নির্দেশে সতীদাহ প্রথার মতো অনাচার সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়। তেমনি আরেকজন সমাজনায়ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় 'বিধবাবিবাহ' প্রথার পুনরুজ্জীবন ঘটে। আবার এদিকে হিন্দুধর্মের 'গৌরীদান' প্রথার অর্থাৎ বাল্যবিবাহ রদে সরকার কর্তৃক সারদা আইন গৃহীত হয়। সুতরাং সমাজের নিয়মের সঙ্গে ধর্মপালনের ব্যাপারটা মিশিয়ে ফেললে যে বিপদ হয় তা থেকে দেখা যাচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বিচারবুদ্ধিও মোটেই মুক্ত নয়। তবে অবশেষে বিচারপতি খেহর কিন্তু একটি সুচিন্তিত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যে সমস্ত বিধি একদেশদর্শী ও লিঙ্গসাম্যের পরিপন্থী তার জন্যে ভারত সরকারের উচিত হবে একটি সুসংবদ্ধ আইন প্রণয়ন করে সামাজিক সাম্য সুনিশ্চিত করা। আসলে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও ব্যক্তিগত অধিকার নিয়ে দেশের মধ্যে কোনও বিভিন্নতা থাকা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। সেটি সম্বন্ধে কোনও গোষ্ঠীর কোনও দ্বিমত থাকাও উচিত নয়।

যেমন মানুষের জন্ম একভাবেই হয়, সুতরাং সব জন্মই আইনত সিদ্ধ এবং মাতার গর্ভসঞ্জাত হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকায় মাতার নামে সেটি নথিভুক্ত করা অবশ্য কর্তব্য যাতে শিশুর রাষ্ট্রীয় অধিকার সুরক্ষিত থাকে। দ্বিতীয়ত যে-কোনও বিবাহ, যে ধর্মমতেই হোক, রেজিস্ট্রি হওয়া বাধ্যতামূলক এবং বিবাহভঙ্গও আইনের দ্বারা স্থিরীকৃত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। সেজন্যে বিবাহ আইন সরল করা উচিত ও বিশেষ বিবাহ আদালত স্থাপন করা কর্তব্য। যত খুশি বিচ্ছেদ ও যতখুশি বিবাহ করা যেতে পারে কিন্তু এককালে একটিমাত্র বিবাহই আইনত সিদ্ধ। তবে বিবাহবহির্ভূত পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্পর্কে কোনও আইনগত বাধা থাকা অবিধেয়। সমস্ত মৃত্যুই তেমনি ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়া অন্ত্যেষ্টি হতে পারে না। এই আইনগুলি খুবই সরল এবং কারোরই আপত্তি হওয়ার কথা নয়।

তবে এই প্রসঙ্গে সেদিনের সেই ক্যালকাটা ক্লাবের বিতর্কের কথা মনে পড়ে। বিষয় ছিল বোধহয় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। পক্ষে ও বিপক্ষে ছিলেন বাঘা বাঘা সব ভারতের কূটতার্কিক, মণিশঙ্কর আইয়ার, সলমান খুরশিদ, বাবরিখ্যাত শাহাবুদ্দিন, অভিষেক সিংভি ও তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাংলার বামপন্থী বুজরুকরা হুমকি দিয়েছিল, মোদীকে ক্লাবে ঢুকতে দেবে না। শাহাবুদ্দিন সাহেব বললেন, তিনি আগে মুসলমান, পরে ভারতীয়। সর্বশেষ বক্তা মোদী বললেন, আমি শাহাবুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে একমত, মুসলমানদের জন্যে শরিয়াত আইনের পক্ষপাতী। তবে সেটা পূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে হবে; চোর ডাকাতের হাত কাটতে হবে বা ব্যাভিচার অপরাধীদের ঢিল ছুঁড়ে মারতে হবে। মোদীজীর এই কথায় হাততালিতে মাঠ ফেটে পড়ল এবং মোদীজীকে সকলে Standing Ovation দিল।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না। টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

মুক্ত চিন্তা, মুক্তমন মানেই কি বামভাবনা?

অমিতাভ সেন

রাধাগোবিন্দ দত্ত, নিত্যানন্দ ঠাকুর, দাশরথি তা, লাবণ্যপ্রভা ঘটক এইরকম সদাবন্দনীয় বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী 'বর্ধমানের ডাক', 'সর্বোদয়' প্রভৃতি পত্রিকা চালাতেন। দুর্গাপুর-আসানসোল ইন্ডাস্ট্রি, মাইনিং এরিয়ার বহু খবর— যা ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের ফসল, ওইসব পত্রিকাগুলোতে প্রকাশ করতেন। তাতে বহু জেলার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হোত। এমন বিশাল, সৌম্য, সৎব্যক্তিত্ব ছিল এইসব মানুষের যে কোনো সমাজশত্রুর চোখ তুলে চাইবার ক্ষমতা ছিল না। তাঁদের অবশ্যই এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক ভাবনা ছিল, কিন্তু বিপ্রতীপ ভাবনার লেখাও লিড কলামে প্রকাশ করতেন। এইসব পত্রিকা কোনো প্রতিষ্ঠান বা লোভের কাছে মাথা বিকিয়ে দেয়নি। সাংবাদিক ধর্মের উৎকর্ষ এই খানেই।

ম্যাকিয়াভেলি যখন ইউরোপে— তখন ভারতে বিরাজ করছেন শ্রীচৈতন্য, গুরুনানক, শঙ্করদেব। কার্ল মার্কসের উৎক্রমণকালে ভারত স্নিগ্ধ হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে। এক শ্রেণীর জানা-মানা ইনটেলেকচুয়াল পরমহংসদেবকে মৃগীরোগী বলতেন; তাঁর মানসপুত্রকে 'চাকরি পায়নি--- তাই সন্ন্যাসী'। যে জিনিস তাঁদের জানা ছাঁচে পড়লো না তার অপব্যাখা করতে ভীষণ উৎসাহ। কয়েকমাস আগেই এইরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। আর এস এসের সরসঙ্ঘচালক মোহনজী ভাগবত ভোঁসলে মিলিটারি অ্যাকাডেমির ছাত্রদের সভায় তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, শুধু বিদ্যাগুণই যথেষ্ট নয়, সমাজকে সশক্ত করার তপস্যাও করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেন। নোবেল প্রাইজ পাবার পর ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপান যান। একটা ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। সভাস্থলে পৌঁছে দেখেন কোনো ছাত্র উপস্থিত নেই। জিজ্ঞাসা করলে উপাচার্য জানান— ছাত্ররা মনে করে পরাধীন জাতির কোনো প্রতিনিধির কাছ থেকে তাদের নতুন করে কিছু শিখবার নেই। চীনেও গুরুদেবের প্রায় কাছাকাছি অভিজ্ঞতা হয়েছিল! মিলিটারি অ্যাকাডেমি সংক্রান্ত সমাচার কলকাতায় ভেসে আসতেই একশ্রেণীর বুদ্ধিবাজ কা-কা করে উঠলেন। অথচ রবীন্দ্র পরিকর পণ্ডিত কালিদাস নাগ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'Critical Notes on India-Asia Creative Unity'তে এই দুটো ঘটনারই উল্লেখ করেছেন। এঁরা অসহিষ্ণুতার ধুয়ো ধরেন অথচ মহাজাতি সদনে নিবেদিতা স্মরণ অনুষ্ঠান বাতিলের ফতোয়া নিয়ে রা কাড়েন না।

লঙ্কেশ পত্রিকার এডিটর পি. লঙ্কেশ ছিলেন ময়মনসিংহ-এর জমিদার ব্যারিস্টার স্নেহাংশুকান্ত আচার্যের স্ট্যাটাসের বামপন্থী (স্মর্তব্য : আমরা কমিউনিস্ট, ভদ্রলোক নই : অশোক মিত্র)। কেউ কেউ দাবি করেছেন লঙ্কেশ নাকি মুক্তচিন্তা প্রকাশের জেনিথ-পয়েন্ট। তখন পশ্চিমবঙ্গে চলছে জ্যোতি বসুর সরকার; নেওয়া হচ্ছে রক্তের বিনিময়ে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ গড়ার সংকল্প, চলছে বইমেলাতে চাঁদা তুলে কনোরিয়া জুটমিল চালানোর ভণ্ডামি আর চন্দন বসুর এবকো বিস্কুট কোম্পানি ডকে তোলার পর্ব। রক্ত পচে নর্দমায় বইলো, কনোরিয়ার জন্য দান করা টাকা কোন মুক্ত চিন্তক প্রফুল্ল বদনে মেরে দিল— কেউ জানে না। আর বাবা যখন মুখ্যমন্ত্রী তখন অভিযুক্ত চন্দনের সরকারি খাজনা মেরে দেওয়া তো বার্থ রাইট। স্যুডো সেকুলার জনাব সেলিম হিন্দুপাড়ায় কমঃ এবং মুসলমান পাড়ায় মহঃ। এইরকম অনেক অভিযোগ একটা প্রবন্ধে বেঁধে (Bengal : A Whimper) লঙ্কেশ পত্রিকার ঠিকানায় পাঠিয়েছিলাম। অনুরোধ করেছিলাম কন্নড় ভাষান্তর করে নেবেন অনুগ্রহ করে। নির্দেশ এসেছিল— গেট ইয়োর এসে ট্রানস্লেটেড; একজন আমার অফিসে ফোন (সেসময় মোবাইল যুগ নয়) করেছিলেন— Too Hersh an Essay— অর্থাৎ বাম সরকারের বিরুদ্ধে কোনো রচনা প্রকাশ করা যাবে না। এই হচ্ছে মুক্তমনের বহর।

ব্যক্তিহত্যা, ব্যক্তিসন্ত্রাসের কোনো সমর্থন সভ্য সমাজে থাকে না। সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ হত্যাকাণ্ড সর্বাংশে নিন্দনীয়। এই সহানুভূতির আবহে তাঁর পেশাদারিত্বকে মুক্তমনের পরাকাষ্ঠা বলে হড়কে দেওয়া যাবে না। এইসব ফাইভস্টার পেন মেন অনেকেই কর্পোরেট অপারেটরস, আমাদের পরিচিত ধুতি পড়া সহাস্যবদন আঢ্যিমশাই নন। এতোদিন এরা মধুভাণ্ডের আশায় নর্থব্লক-সাউথ ব্লকে ভিড় জমাতো। সরকারি খরচে প্রধানমন্ত্রীর বিদেশযাত্রায় সফরসঙ্গী হোত। এখন সেসব রাস্তা বন্ধ। তিস্তা শিতলওয়াড, বরখা দত্তের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও দালালির অভিযোগ আছে। রোহিঙ্গা জনগণ সম্বন্ধে লেখালিখি করেন কিন্তু নিজবাসভূমে পরবাসী তিন লক্ষ হিন্দু কাশ্মীরির উৎখাত নিয়ে লেখার কলম খুঁজে পান না। কেরল, কর্ণাটকে কত স্বয়ংসেবক বিজেপিকর্মী খুন হয়েছেন হিসেব নেই। অনেক আইএএস/আইপিএস অফিসার কর্মরত অবস্থায় ফেরত হয়েছেন। কর্ণাটকে কোনো কংগ্রেসি হোমমিনিস্ট্রি নিতে চায় না। মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট দুদিন আগে রাজ্য সরকারকে সেনসর করেছেন। মাওবাদী এলাকায় খনি মালিকদের কাছ থেকে তোলার টাকার এক বড়ো অংশের সামালদার এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিকরা— এমন অভিযোগও আছে। নোটবন্দি পাকা ধানে মই চালিয়ে দিয়েছে। রেস্ততে টান পড়েছে, বনে বাদাড়ে রেশন আসবে কোথা থেকে? তাই মাওবাদীদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা বাহানামাত্র। গৌরীর ভাই বলেছেন থ্রেট ছিল মাওবাদীদের কাছ থেকে। কানহাইয়া কুমারকে দত্তকপুত্র স্বীকার করেছিলেন। ঠিকই, একেই বলে ভালুকে চেনে শাঁখ আলু। ■

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে স্বামীজীর শিকাগো ভাষণের ১২৫ বর্ষ উদযাপন

সংবাদদাতা॥ স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণের ১২৫ বর্ষ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে নানা ধরনের কার্যক্রম হয়ে গেল। স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বর্ষ উদযাপন সমিতি

স্বামীজীর পৈতৃক ভিটার সামনে বক্তব্য রাখছেন স্বপন দাশগুপ্ত।

এইসব কার্যক্রমের উদ্যোক্তা। সমিতির প্রাদেশিক সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস।

গত ১১ সেপ্টেম্বর সকালে কলকাতায় স্বামীজীর পৈতৃক বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কলকাতার তিন দিক থেকে আসা বাইক র‍্যালির মাধ্যমে কয়েক হাজার যুবক সেখানে সমবেত হন। বিশিষ্ট সাংবাদিক স্বপন দাশগুপ্ত বর্তমান ভারতে স্বামীজীর শিকাগো ভাষণের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। বর্তমান ভারত, বিশেষত বাংলায় স্বামীজী কথিত 'গর্বের সঙ্গে বলো আমি হিন্দু'— এই বাণীতে উদ্দীপ্ত হয়ে হিন্দু সমাজের সংগঠিত হওয়া আজ সময়ের দাবি। রাজ্যের মোট ১৬২ স্থানে বাইক র‍্যালির আয়োজন হয়েছিল। বাইক র‍্যালিতে ২৩৯২২ জন এবং সাইকেল র‍্যালিতে ২০,০০০ যুবক অংশগ্রহণ করেছিল। সাইকেল র‍্যালি হয়েছিল ২৩২ স্থানে। রাজ্যের ৩৮২টি ব্লক, ১৮৫০টি অঞ্চল (মণ্ডল) থেকে যুবকরা এইসব কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। রাজ্য জুড়ে ১৯৬টি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রম হয়, সেখানে ৭৮১৫ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। কার্যক্রম উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে প্রায় ২ লক্ষ মানুষ যোগ দেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই উপলক্ষে যে সমিতি গঠিত হয়েছিল, সেইসব সমিতিতে রাজ্যের ১৪৫০ বিশিষ্টজন অংশ নিয়েছিলেন। সমিতির প্রাদেশিক সম্পাদক তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত এইসব তথ্য জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এই সব পরিসংখ্যানের মধ্যে উত্তরবঙ্গও রয়েছে। উত্তরবঙ্গে ৭২ স্থানে বাইক র‍্যালিতে ৮০০০ এবং ৪০ স্থানে সাইকেল র‍্যালিতে ৪৫০০ জন অংশ নেয়। সব মিলিয়ে ২০ হাজারেরও বেশি যুবক অংশগ্রহণ করে। উত্তরবঙ্গে ২৫টি স্থানে জনসভা হয় যেখানে ৬০০০০ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বারাসতে বাইক র‍্যালিতে বিপুল সাড়া মিলেছে। দুর্গাপুরে ১১ সেপ্টেম্বর দিনটি বিশ্বভ্রাতৃত্ব দিবস হিসেবে পালিত হয়। কাঁথির বাইক র‍্যালিতে অভূতপূর্ব উন্মাদনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এছাড়া কলকাতার গোলপার্ক রাসবিহারী মোড়-সহ বিভিন্ন স্থানে বাইক র‍্যালি বেরিয়েছিল। পুরুলিয়া ও ঝালদাতেও বাইক র‍্যালি হয়। এক কথায় রাজ্যের প্রতিটি জেলা সদরে তো বটেই, প্রায় সব ব্লকেই কোনও না কোনও ভাবে স্বামীজীর শিকাগো ভাষণের ১২৫ বর্ষ উদযাপিত হয়।

বসিরহাটে বাইক র‍্যালি।

মালদায় বিবেকানন্দের সাজে ছাত্রছাত্রীরা।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা।

গল্প

বাঁদরের কীর্তি

রামপুরের দত্তপাড়া একটি শান্তিপ্রিয় জায়গা। দুর্গাপুজো, কালীপুজো, রক্তদান শিবির, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, এসব নিয়ে পাড়ার ছেলেদের সারা বছর ব্যস্ততার শেষ নেই। বছরে একবার হয় নবীন স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্ট রামপুরের সেবক ক্লাবের সঙ্গে জোড়ামন্দিরের স্বামীজী ক্লাবের

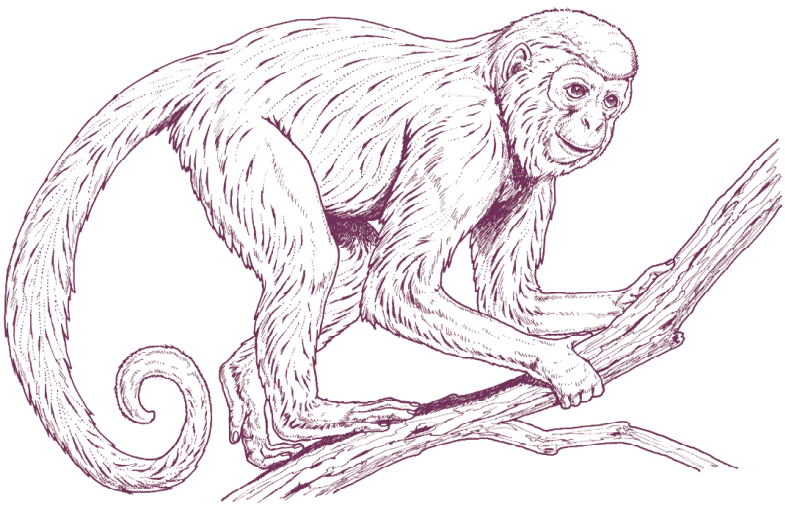

প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। আমোদে কাটে সবার দিন।

এই শান্তিপ্রিয় জায়গায় হঠাৎ করে এক অশান্তির উদয় হলো। কয়েকদিন পাড়ায় কোথা থেকে একটি বাঁদর এসে জুটেছে। বাঁদরটির জ্বালায় এলাকাবাসী অতিষ্ট। ছোটরা স্কুলে যেতে পারে না একা একা। বাঁদরটি সুযোগ পেলেই বাচ্চাদের চড়-থাপ্পড় লাগিয়ে দেয়। স্কুলের হেডমাস্টার সেদিন স্কুলে যাচ্ছিলেন, সেই সময় বাঁদরটা তাঁকে আক্রমণ করলো। পরনের সাদা ধুতি ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দিল। পল্টনদের বাড়ির কাজের মাসি সন্ধ্যেবেলা যাচ্ছিল গিন্নিমার জন্য পুজোর ফল নিয়ে। রাস্তায় বাঁদরটি তা লুঠ করে নিলো। একটি বাঁদর পাড়ায় এমন গুণ্ডামি করছে তা মানা যায় না। পরের দিন তারা লেগে পড়লো বাঁদরটিকে শেকল দিয়ে বাঁধার জন্য। সফলও হলো। বাঁদরটি ধরা পড়লো। রাস্তার ধারে ক্লাবের বারান্দায় শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হলো বাঁদরটিকে। পাড়ার এক পশুপ্রেমী এতে আপত্তি করলো বটে, কিন্তু তার আপত্তি কেউ কানেই তুললো না।

কদিন পরেই নবীন স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট। প্র্যাকটিস চলছে। ছেলেরা সব প্র্যাকটিসে চলে গেল। রাস্তা দিয়ে চলতে সবার নজর যায় বাঁদরটির দিকে। কেউ পাকা কলা দেয়, বাঁদরটি খেয়ে নেয়। স্কুলের যাওয়ার সময় বাচ্চারা বাদাম, বিস্কুট খাওয়ায়। যার অত্যাচারে সবাই এতদিন অতিষ্ট ছিল সেই বাঁদরটি কদিনের মধ্যে সবার আদরের হয়ে গেল। পল্টনদের কাজের মাসি এখন রোজ দুবেলা খাবার দিয়ে আসে।

এদিকে টুর্নামেন্টের দিন এগিয়ে এসেছে। সবাই উত্তেজিত। চায়ের দোকানে আলোচনা এবারে কে জিতবে? অবশেষে এলো সেই দিন। সকাল থেকে মাইক বাজছে। বেলা বাড়তেই খেলা শুরু হয়ে গেল। পাড়া যেন মাঠে ভেঙে পড়েছে। গিজগিজ করছে মানুষ। বিকেলের দিকে মাইকে ঘোষণা হলো ফাইনালে উঠেছে সেবক সঙ্ঘ ও স্বামীজী সঙ্ঘ। এবার ফাটাফাটি লড়াই শুরু হবে। দোকান বন্ধ করে, হাতের কাজ ফেলে সবাই ছুটলো মাঠের দিকে। খেলা চলছে। সেবক সঙ্ঘ পর পর দুটি গোল খেলো। দত্ত পাড়ার সবাই মুষড়ে পড়েছে। কী হবে কে জানে। হাফ টাইমে একটি গোল দিল সেবক সঙ্ঘ। হাফ টাইমের পরে আবার একটি গোল। এদিকে সময় বেশি নেই। সবাই ভাবছে শেষে যেন ড্র হয়ে না থাকে।

সেবক ক্লাবের নাম করা ফুটবলার আবেশ নামলো শেষ সময়। মাঠে নেমেই সে বল নিয়ে দৌড়তে লাগলো গোলের দিকে। প্রথমবার কিছু হলো না। আবার চেষ্টা দ্বিতীয়বার। বলটি একেবারে গোলের কাছে। গোলকিপার বলটি ধরার জন্য রেডি। এমন সময় একটি বাঁদর ঢুকে পড়লো মাঠের ভিতর। বাঁদরটি ভেংচি দেখাতে লাগলো গোলকিপারকে। গোলকিপার বেচারা পড়লো মহাবিপদে, বল ধরবে না বাঁদর তাড়াবে। সেই সুযোগে আবেশ জোরে একটি শট দিল। বল একেবারে গোলের ভিতর।

স্বামীজী ক্লাব চিৎকার করতে লাগলো। এটা হতে পারে না। কিন্তু রেফারি সেকথা শুনলো না। সেবক ক্লাব জিতে গেল। দত্ত পাড়ার সবাই চিনতে পেরেছিল বাঁদরটিকে। তাদের পাড়ার শেকলে বাঁধা সেই বাঁদর, যার জন্য আজ সেবক ক্লাব খেলায় জিতে গেল।

পাড়ায় ফিরে এসে ক্লাবের ছেলেরা ঠিক করলো আজ থেকে বাঁদরটিকে আর বেঁধে রাখা হবে না। সে যখন নিজে শেকল খুলে মুক্ত হয়েছে, তখন সে মুক্তই থাকবে।

বিরাজনারায়ণ রায়

ভারতের পথে পথে

শ্রাবণবেলাগোলা

কর্ণাটকের হাসান জেলার চান্নারেয়াপটনার কাছে ছোট্ট শহর শ্রাবণবেলাগোলা। জৈন ধর্মাবলম্বীদের বিখ্যাত তীর্থস্থান গোমতেশ্বর এখানে অবস্থিত। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য জৈনধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পর এখানে বসবাস করেছিলেন। এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এখানকার দুই বিখ্যাত পাহাড় চন্দ্রগিরি এবং বিন্ধ্যগিরি। কথিত আছে, আচার্য ভদ্রবাহু এবং তাঁর শিষ্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এখানে ধ্যান করতে আসতেন। পরে সম্রাট অশোক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করান। এই স্তম্ভের নাম চন্দ্রগুপ্ত বাসাডি। গোমতেশ্বরে বারো বছর অন্তর হাজার হাজার ভক্ত সমবেত হন মহামস্তকাভিষেক অনুষ্ঠানে। এই দিন গোমতেশ্বরের মূর্তিকে স্নান করিয়ে হলুদ, চালগুঁড়ো এবং চন্দন দিয়ে সাজানো হয়। পরের মহামস্তকাভিষেক অনুষ্ঠিত হবে ২০১৮ সালে।

এসো সংস্কৃত শিখি

কিয়ত্কালং তিষ্ঠতি ?
কতক্ষণ থাকবে?
অহম্ অপি এতাং বার্তা শ্রুতবান্।
আমিও এই খবর শুনেছি।
সঃ স্তোকাত্ মুক্তঃ।
সে বিপদ থেকে বেঁচে গেল।
ভবন্তং দ্রষ্টুং সঃ পুনঃ।
আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য।
আগচ্ছতি কিম্।
সে আবার আসছে কি?

ভালো কথা

সমুদ্র বন্ধু

এবার স্বাধীনতা দিবসে আমি বাবা-মার সঙ্গে পুরী বেড়াতে গিয়েছিলাম। সমুদ্র এত বিশাল হয় আমার জানা ছিল না। যেদিকে তাকাই শুধু জল আর জল! আর কী বড়ো বড়ো ঢেউ। বাবা বলল, 'এই সমুদ্রের নাম বঙ্গোপসাগর। ইংরেজিতে বে অব বেঙ্গল।' পরের দিন স্নান করতে যাওয়া হলো। যদিও নুলিয়াকাকু আমার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছিল, তবুও পাহাড়ের মতো ঢেউ দেখে আমার ভয় করছিল। নুলিয়াকাকু বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। আমার হাতটা আরও শক্ত করে ধরে বলল, 'কোনও ভয় নেই। আমি আছি না!' এই কথা শোনার পর আমার আর ভয় করেনি।

সোমনাথ রায়, সপ্তম শ্রেণী, রিষড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

জয় মা দুর্গা

অভিদীপ মিত্র, একাদশ শ্রেণী

মা আসছেন বছর ঘুরে
আসছে মা গো আবার ফিরে
নৌকো হাতি কিংবা দোলায়
মা আসছেন রূপোর ঘোড়ায়।
সোনায় রুপোয় সাজবে মাগো
নিধন হবে অসুরদল
তোমার মতো শক্তি নিয়ে
জাগবে নারীকুল।

চারদিন পর মাগো তুমি
যাবে শ্বশুর বাড়ি
যাওয়ার বেলায় দাওগো কথা
ফিরবে তাড়াতাড়ি।
মায়ের পুজোর আনন্দেতে
জয়ধ্বনি সবার মুখে
মা দুর্গার জয়
এবার বলো সবাই মিলে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

কেরেন ডিসুজা ভারতের অশ্বমানব

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অশ্বমানব ছাড়া আর কীই বা বলা যায়! তেইশ বছরের এক যুবক ২৪৬ কিলোমিটার ম্যারাথনে (যার পোশাকি নাম স্পার্টাথলন) শুধু অংশগ্রহণই করেননি, দৌড় শেষ করে পুরস্কারও পেয়েছেন, এর থেকে ভালো নাম তার আর কী হতে পারে!

স্পার্টাথলন সারা বিশ্বে কঠিনতম দৌড় হিসেবে পরিচিত। নাগপুরের বাসিন্দা কেরেন ডিসুজা এ হেন স্পার্টাথলনে ২৪৬ কিলোমিটার দৌড়ে সারা বিশ্বের দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ করেছেন। এর আগে আর কোনও ভারতীয় এই অসাধ্যসাধন করতে পারেননি। যে কারণে এই মুহূর্তে দূরপাল্লার দৌড়ে কেরেন ডিসুজা ভারতের অটোমেটিক চয়েস।

খেলাধুলো সম্পর্কে যারা একটু আধটু খবর রাখেন, ম্যারাথন দৌড়ের কথা উঠলেই তাদের চোখ কপালে ওঠে। ৪২ কিলোমিটারের নীচে ম্যারাথন হয় না। ফিটনেস বজায় রেখে ৪২ কিলোমিটার দৌড়নো বেশ কঠিন ব্যাপার। প্রায়শই চোট লাগে। কেরেন যেমন এখন রিহ্যাবে আছেন। কিছুদিন আগে হংকং-এর বিখ্যাত ম্যারাথনে (১০০ কিলোমিটার) দৌড়তে গিয়ে বড়োসড়ো আঘাত পেয়েছেন। একটু সুস্থ হলেই আবার ট্র্যাকে নেমে পড়বেন।

কেরেনের দিন শুরু হয় সকাল সাতটায়। প্রথমেই শূন্য ডিগ্রিরও কম তাপমাত্রায় দু'ঘণ্টা ধরে দৌড়ের অনুশীলন চলে। তারপর ব্রেকফাস্ট। খাওয়া সেরেই দৌড়তে হয় জিমে। সেখানে চলে পেশি শক্ত করার নানারকম এক্সারসাইজ। ম্যারাথনারদের সম্পদ তাদের পায়ের পেশির জোর। জিমে কেটে যায় ঘণ্টাদুয়েক। এরপরে কিছুক্ষণ কেরেন একটু রিল্যাক্স করেন। তিনটে নাগাদ শুরু হয় পাহাড়ে চড়ার অনুশীলন। সন্ধ্যেবেলায় আবার দৌড়। শেষমেশ রাত আটটা নাগাদ ছুটি মেলে।

ছেলেবেলা থেকেই কেরেন ভালো অ্যাথলিট। যদিও ম্যারাথন শুরু করেছেন মাত্রই কয়েক বছর আগে, কলেজে পড়ার সময়। শুরুর সেই দিনগুলোর স্মৃতিরোমন্থন করে কেরেন বলেন, 'কলেজে থাকার সময়েই আমি একটা ইন্টার-কলেজ দৌড় প্রতিযোগিতার কথা শুনেছিলাম। খানিকটা ঝোঁকের বশেই নাম দিয়ে ফেলেছিলাম। ১২ কিলোমিটার দৌড়নোর পর মনে হচ্ছিল জাস্ট মরে যাব। অভিজ্ঞতাটা খুব সুখের ছিল না। যাই হোক, নাগপুরে আসার পর আমি আর একটা প্রতিযোগিতার কথা জানতে পারি। এটা ছিল ১০ কিলোমিটারের। এখানে দৌড়নোর অভিজ্ঞতা অবশ্য ততটা খারাপ ছিল না।'

অভিজ্ঞতা ভালো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যারাথনের প্রতি ভালোবাসার বীজও অঙ্কুরিত হলো। ২০১২ সালে কেরেন সিদ্ধান্ত নিলেন নিজেকে একজন ম্যারাথনার হিসেবেই প্রতিষ্ঠা করবেন। একটা বেশ ভালো চাকরি পেয়েছিলেন কিন্তু অ্যাথলেটিক্সের প্রতি ভালোবাসায় সেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। কয়েকটি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবার পর তিনি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন— ম্যারাথন তো হলো, এবার স্পার্টাথলন।

কেরেন বলেন, 'স্পার্টাথলনে অংশ নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে দূরপাল্লার দৌড়ে ভালোরকম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সেইসঙ্গে পূর্বনির্ধারিত সময়ের মধ্যে দৌড় শেষ করাও জরুরি। যেমন ১০০ কিলোমিটার দৌড়তে হবে ১০ ঘণ্টায়, ১০০ মাইল বাইশ ঘণ্টায়। আমি সলোমন ভাট্টি লেকের ১৬০ কিলোমিটার দৌড় কুড়ি ঘণ্টা বত্রিশ মিনিটে শেষ করেছিলাম। যার জন্য আমি স্পার্টাথলনে অংশ নেবার সুযোগ পাই।'

যতদিন শক্তি থাকবে কেরেন ডিসুজা এইভাবে দৌড়তে চান। নদীনালা, পাহাড়জঙ্গল পেরিয়ে পৌঁছতে চান নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এবং তা সময়ের অনেক আগেই। সময় কখনও থামে না, তিনিও থামবেন না সহজে।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
25 September - 2017 - Rs. 10.00,
Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18

SURYA
Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

Wide beam angle for better light spread

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা ।।